BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

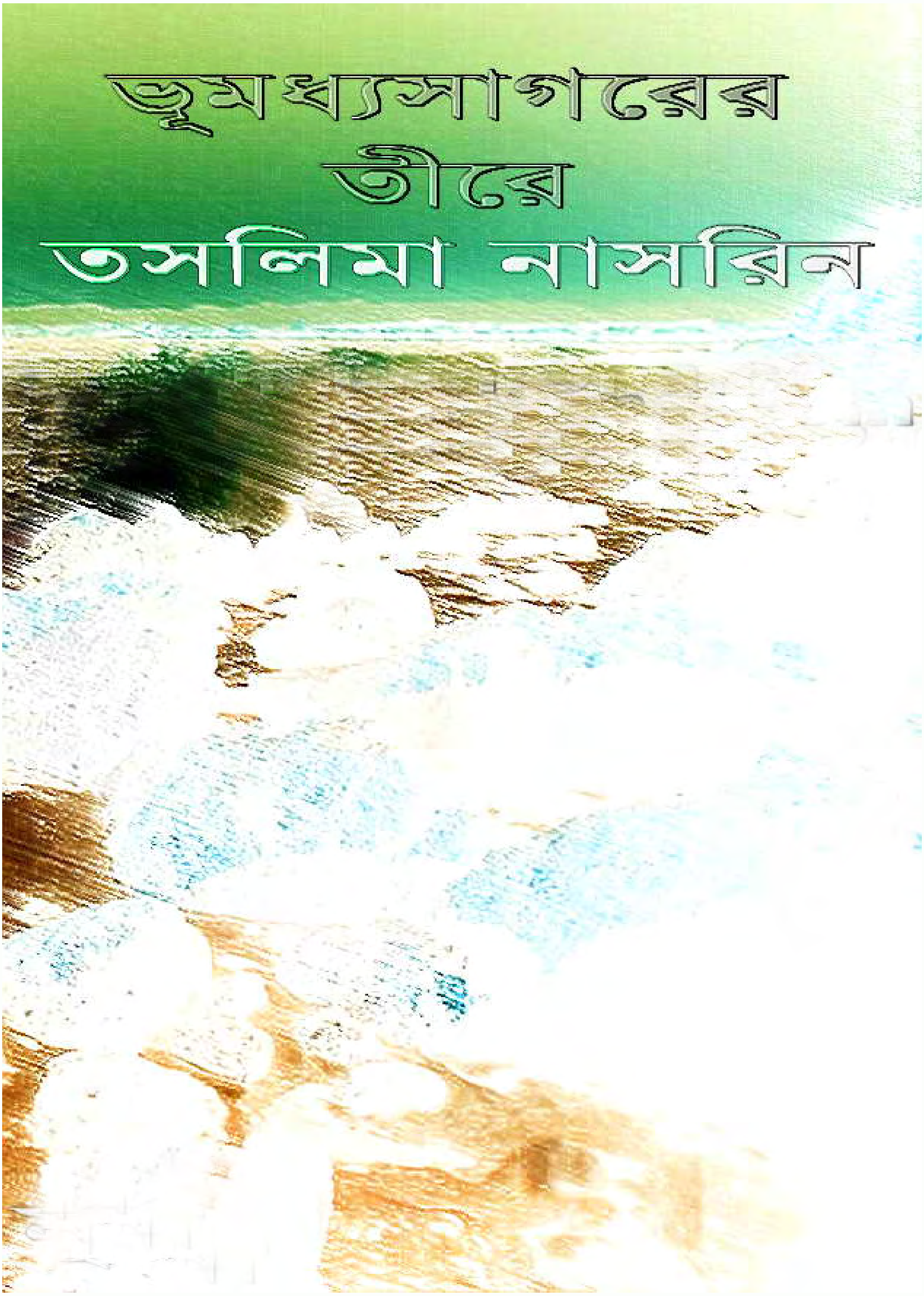

www.BDeBooks.Com

ভূমধ্যসাগরের তীরে

১.

কার নাম আগে নেব? পিকাসো না কলম্বাস? কলম্বাস নিয়ে তর্ক আছে অবশ্য। অনেকে দাবি করে কলম্বাস ইতালির। কেউ বলে কলম্বাস স্প্যানিশ ছিল। বার্সেলোনায় ভূমধ্যসাগরের তীরে, যেখানে কলম্বাসের মূর্তি, তার নিচে দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্ন জেগেছিল প্রথমেই যে, ডান হাত তুলে কিছু একটা দেখাচ্ছে কলম্বাস, তার আসলে দেখাবার কথা আমেরিকা, কিন্তু সে দেখাচ্ছে একেবারে আমেরিকার উল্টোদিক, ইতালি। তবে কি কলম্বাস বলছে আমাকে স্পেনের রাস্তায় রেখেছো কেন, ওই তো ইতালি আমার দেশ। আসলে মূর্তিটি স্পেনের অপরপ্রান্তে অতলান্তিকের তীরে রাখা উচিত ছিল, কলম্বাস তো আর ভূমধ্যসাগরপথে আমেরিকা আবিস্কার(!) করেনি। তবে ইতালিয়রা যতই কলম্বাসকে নিজের বলে দাবি করুক, আমার মনে হয় কলম্বাস স্প্যানিশই ছিল। তা যাক, পিকাসোকে নিয়ে কিন্তু কোনও তর্ক নেই যে আদৌ সে স্প্যানিশ ছিল কী না। খোদ ম্যালাগায় তার জন্ম। বারসেলোনায় পিকাসোর বাবা মা চলে আসে ছেলের যখন চৌদ্দ বছর বয়স। তার আগেই, বারো তেরো বছর বয়সেই ল্যান্ডস্কেপে হাত পাকানো হয়ে গেছে পিকাসোর। বাবা ছিলেন শিল্পকলার শিক্ষক। সেদিক দিয়ে সুবিধেই ছিল। পিকাসো যখন মায়ের ছবি আঁকছে, মায়ের শরীরের ফিনফিনে সাদা পোশাকের ছবি, সেই বয়সে, তখন কত সন -আঠারোশ বিরানব্বই, তখন ট্রান্সপারেন্সি এত চমৎকার ফুটেছে কী না কারও ছবিতে আমার জানা নেই। বারসেলোনার বাড়ির ছাদে বসে ওই পুচকে ছেলে ভূমধ্যসাগরের চেয়ে বেশি এঁকেছে নাগরিক জীবনের ছবি। প্রথম দিকে ছবির রং,ঢং সবই স্পষ্ট বোঝা যায়, ছিল অ্যাকাডেমিক -যিশু মেরির ছবি, সাদা আর লাল রঙের বাড়াবাড়ি ব্যবহার, সেন্টারে অবজেক্ট বসানো। অবশ্য পরে এসব পাল্টে যায়। ল্যান্ডস্কেপেও গ্রাম আর পাহাড় চলে আসে। নীল আর গোলাপি সময়ের কিছু ছবি, কিউবিজমের চর্চা, আর চশমাচোখের বন্ধু সেবেরেটেসের মুখ বারবার, বারসেলোনার এই মিউজিয়মে। আমার জন্য মিউজিয়ম স্পেশাল করা হয়েছিল, তার মানে নো পাবলিক। আমি একা দেখব মিউজিয়ম। সঙ্গে

থাকবে মিউজিয়মের ডিরেক্টর আর আমার নিরাপত্তারক্ষী। এসব অবশ্য বাড়াবাড়ি। আমাকে নিয়ে ইওরোপের বাড়াবাড়িগুলো এখন অসহ্য লাগে। প্যারিসের লুভর এ যদি প্রাইভেট ভিজিট হয়, তবে বারসেলোনার পিকাসো মিউজিয়াম তো নস্যি। যাই হোক, সাফ কথা আমি বলে দিয়েছি ওদের, যে, বাবা আমি অতি সাধারণ মানুষ, আমি মানুষের মতো দুপায়ে হাঁটতে চাই রাস্তায়, আমার অত সামনে পেছনে প্রহরী দরকার নেই। কেউ আমাকে এখানে খুন করবে না, খুন যারা করবে তারা ঢাকায় বসে চিল্লাচ্ছে। ওরা, মানে আয়োজকরা রাস্তায় ঘোরার ব্যবস্থা করেছিল ঠিকই, তবে প্রহরী সরায়নি। লা রাম্বলাতে মহা সুখে হাঁটলাম। আগে, অনেক আগে এখানে নদী ছিল, এখন একটি দীর্ঘ পথ সমুদ্র বরাবর- মধ্যিখানে প্রশস্ত পথ হাঁটার, দুপাশে সরু সরু গাড়ি চলার। শহরে দুটো লা রাম্বলা। একটি ফুল আর পাখির দোকানে ভরা। আরেকটিতে দোকান নেই, কিন্তু মানুষের ঢল মধ্যরাত অবদি। অনেকটা আমস্টারডামের রাস্তার মতো। মানুষ গিজগিজ করছে আর গানের দল বসে গেছে গান গাইতে টুপি বা বাসন ফেলে, এর মানে পয়সা দাও। অদ্ভুত ওই জ্যান্ত মূর্তিগুলো, দাঁড়িয়ে থাকে নো নড়নচড়ন, কারও কারও পায়ের কাছে ক্যাসেটে গানও বাজে। লারাম্বলায় আগপাশতলা সাদা রঙে ঢাকা একটিকে পাথরের মূর্তি বলে ভুল করেছি। পাককা দশমিনিট পলকহীন পর্যবেক্ষণের পর বুঝেছি এ জ্যান্ত। বারসেলোনায় রাস্তায় মুগ্ধ হবার মতো একটি জিনিস আমি পেয়েছি, এ অবশ্য লারাম্বলায় নয়, একেবারে গভরমেন্ট হাউজের সামনে। তাঁবু খাটানো, পোস্টার ঝোলানো, ছেলে মেয়েরা কনকনে শীতে রাস্তায় অবস্থান ধর্মঘট করছে। কেন? না তারা নতুন বাজেট মানে না। কারণ এতে তৃতীয় বিশ্বকে সাহায্যের অংক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি মুহূর্তে অনুভব করলাম আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটি আনন্দ নেমে যাচ্ছে শরীরে, আর বুকের মধ্য থেকে একশ গোলাপের ঘ্রাণ ভেসে আসছে, এই পৃথিবীতে তবে মানুষ এখনও আছে, যে মানুষ মানুষের মঙ্গলের দাবিতে ঘরবাড়ি ফেলে তাঁবুতে জীবন কাটায়। এরা দরিদ্র দেশগুলোর জন্য এবারের সরকারি সাহায্য ০.৫ পারসেন্টকে বাড়িয়ে গতবছর যা ছিল, ০.৭ পারসেন্ট - তাই করতে চায়।

উনিশে ডিসেম্বর রাতে গভরমেন্ট হাউজের সামনের স্প্যানিশ যুবকদের ধর্মঘট দেখার পর হাঁটতে হাঁটতে গথিক দেখা, বা ক্যাথিড্রাল দেখা কিছুতে মন তেমন ভরেনি। লোকে বলে বারসেলোনায় ক্যাথিড্রাল নাকি সাংঘাতিক কিছু। কিন্তু আমার কাছে স্ট্রাসবুর্গের ক্যাথিড্রালকেই মনে হয়েছে সবচেয়ে সবার থেকে অবাক করা। আর গাওদি, গাওদি নিয়ে এখানে বেশরকম হইহই আছে। নামকরা স্থপতি ছিলেন গাওদি, ষাট বছর আগে গির্জার একটি কাজ ধরেছিলেন -সেটির কাজ এখনও চলছে, লোকে এখনও মাটি খুঁড়ছে, যন্ত্র ঘুরছে ভোঁ ভোঁ করে। প্রথম দেখেই এই ভীষণ উঁচু মতো জিনিসটিকে আমি ভালোবাসতে পারিনি, সেটি গির্জা বলে নয়, একসময় ধর্মের দালানকোঠা দেখার বিষয়ে কোনও উৎসাহ ছিল না আমার, এখন পুরোনো স্থাপত্য দেখায় আগ্রহ বাড়ছে। তাই বলে নতুন করে কোনও গির্জা গড়ার কোনও কারণ দেখি না। গাওদি বলেই যে গির্জাখানার নির্মাণ পুরো করতে হবে অথবা জাপানি ট্যুরিস্টরা এসে ক্লিক ক্লিক করে ছবি তোলে বলে, এ কোনও কথা নয়। গাওদি একটি কাজ

www.BDeBooks.Com

করেছিলেন নতুন, গির্জার গায়ে গরু ঘোড়া সাপ মাছ শামুক হাস মুরগি সব সেঁটেছেন, কেবল যে ক্রুশ বিদ্ধ যিশু আর মাতা মেরি দাঁড়িয়ে থাকবে নিষ্পাপ মুখে তা তিনি মানেননি। বেঢপ গির্জাটির চেয়ে গাওদির করা বাড়িঘরের ডিজাইন বরং আমাকে মুগ্ধ করেছে। গাওদির এই গির্জাটির সম্পূর্ণ পাবলিকের পয়সায় হচ্ছে, পাবলিক এই স্থাপত্যকে সরকার বা সংস্থার হাতে দেবে না কিছুতেই। পৃথিবীর সর্বত্র আবেগপ্রবণ মানুষের দেখা মেলে, স্প্যানিশ পাবলিক মনে হয় কিছুটা স্পেশাল, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের কাজকে রীতিমত নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিল। গাওদির কাজ আমি দেখেছি দিনের বেলা, কুড়ি তারিখ বিকেলে, সকাল আর দুপুর নানা আয়োজনে অনুষ্ঠানে সভায় বক্তৃতায় কাটিয়ে, পরে। মাদ্রিদ থেকে চলে এসেছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী, চমৎকার মহিলা, জনপ্রিয়ও খুব। বইয়ে সই করিয়ে নিলেন। গালে গাল লাগিয়ে ছবি তুললেন, প্রেস কনফারেন্সে আমাকে সমর্থনের কথা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন। আরও অনেকেই প্রকাশক, সম্পাদক, লেখক আমার বই নিয়ে আলোচনা করলেন, পাঠও করলেন একজন, সিলভিয়া কুরেনি লজ্জার একটি অংশ বার করে বললেন, *বিশেষ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি এতে যে সুরঞ্জন বলছে আমি একজন মানুষ ছিলাম, মুসলিম মৌলবাদীরা আমাকে মানুষ থাকতে দিল না, হিন্দু বানিয়ে ছাড়লো।* সিলভিয়ার জন্ম ইতালিতে, কুড়ি বছর আগে বারসেলোনায় এসেছেন, অবশ্যই প্রেমের কারণে, যদিও প্রেম শেষ অবদি টেকেনি, থেকে গেছেন বারসেলোনাকে ভালোবেসে, কাজ করেন *এডিশন বি* প্রকাশনীতে। বারসেলোনাকে আসলে ভালোবাসার মতো একটি শহর, টগবগ করছে যৌবন। মধ্যরাতেও রেস্তোরাঁগুলোয় দিনের মতো আলো আর জমাট আড্ডা। লন্ডন বা প্যারিস শহরের মতো অমন বড়সড় ব্যাপার নয়, কিছুটা সামুদ্রিক, কিছুটা ঝাল মেশানো- টিপিক্যাল ক্যাটালান খাবার হচ্ছে মশলা মাখানো ভাত মাছ। ভাত যদিও মোটা চালের খেতে আমাদের বিরুই চালের ভাতের স্বাদ নয়, তবু তো ভাত, ভাত খেয়েছি ভূমধ্যসাগরের ওপর বানানো টিকট্যাকটো রেস্তোরাঁয়। নতুন রেস্তোরাঁ। নতুন একটি শহর গড়ে তুলেছেন বারসেলোনার মেয়র পাসকুয়াল ম্যারাগেল দু বছর আগে, অলিম্পিকের সময়। নতুন বাড়িঘর, হোটেল, রেস্তোরাঁ। সামারে শুনেছি রেস্তোরাঁগুলোয় বসার জায়গা পাওয়া যায় না, এত ভিড়, নরডিক দেশগুলো থেকে বরফে ডোবা মানুষগুলো চলে যায় স্পেনে রোদ পোহাতে। রোদ আমারও পোহাতে ইচ্ছে করে, অবশ্য একা নয়, সঙ্গে তাকে নিয়ে, তাকে তো ইওরোপে আসার পর হারিয়েছি, হারানোর বেদনাকে অবশ্য হারাতে পারিনি, সে থাকে বুকের যে হাড় আছে, তার তলায় লুকিয়ে, মাঝে মধ্যেই। সিগাল উড়ছে সামনে, আর খাচ্ছি অক্টোপাস, ক্যালামার, মংফিস ইত্যাদি ইত্যাদি নানারকম মাছ, বারসেলোনা আসলে মাছের শহর, সঙ্গে কিছু হৃদয়বান মানুষ, গল্প করতে করতে, আমি তখন আসলে ভাবছিলাম আবার আসবো আমি বারসেলোনায়, লা রাম্বলায় হাঁটতে, সমুদ্রতীরে রোদ পোহাতে। আবার আসবো আমি..। আসলে যেখানেই যাই যে কোনও দেশে বা শহরে, মনে মনে বলি আবার আসবো, আবার কী আর আসা হয়!

একদিন ক্যাটালুনিয়ার কালচারাল মিনিস্টার দেখা করলেন। মেয়র আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সিটি হলে। আমাকে সামারে যেতে বললেন আবার বারসেলোনায়। বললেন, তুমি যদি সামারে আসো, তবে আমি তোমাদের দেশে বেড়াতে যাবো একদিন। লোকটি রোমান্টিক বটে। আমাকে নাকি পেরুভিয়ান লাগে দেখতে। মন্তব্যটি লন্ডনেও শুনেছি। ইংরেজ বন্ধুরা বলে। পেরুভিয়ান? বাদামি হ্যাটটি পরে যখন কোথাও বেরোই, নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, কী হে পেরুভিয়ান, কেমন আছো, মনে মনে একচোট হেসে নিই, কোথায় ময়মনসিংহ আর কোথায় পেরু! জগতটি ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে। বারসেলোনার মেয়র সোশালিস্ট পার্টির, বেশ জনপ্রিয় এখানে। মেয়র তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। ভাস্কর গারগুয়ালের মেয়েকেও ডেকেছিলেন বাড়িতে। ও এসেছে ফ্রান্স থেকে। গারগুয়ালের কাজ মুগ্ধ করার মতো। বিশেষ করে ব্রোঞ্জ আর কপারে করা নারীর মুখ। গারগুয়াল মারা গেছেন উনিশশ ছত্রিশে। শেষ দিকে তিনি মূর্তির শরীর থেকে গালটুকু বুকটুকু পেটটুকু কেটে বাদ দিতেন। শূন্যতাকে তিনি তাঁর কাজে এমন পুরে দিয়েছিলেন যে মনে হল এই শূন্যতাই তাঁর কাজকে পূর্ণ করেছে বেশি। সিটি হলে তাঁর শেষজীবনের একটি ভাস্কর্য রাখা। গ্রীক পুরানের জিউস ছুটছে ঘোড়ায়, সমুদ্র পথে। ব্রোঞ্জের কাজ। ঘোড়াটির পেট খালি। প্রথমেই চোখ চলে যায় শূন্যতার দিকে। গারগুয়ালের নারীমূর্তিগুলোর উরু খুব মোটা মোটা। মোটা উরুর অর্থ কী হতে পারে! ব্যাপারটি কী হতে পারে? মেয়ে বলল, আমার বাবা মেয়েমানুষের প্রতি খুব আসক্ত ছিল। তা ছিল। কিন্তু উরু কেন এমন হঠাৎ গাছের গুঁড়ির মতো মোটা হয়ে উঠলো। বাকি শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। নারীকে কর্মঠ এবং শক্তিমান বোঝানোর জন্য? হবে হয়তো। অসলোয় গুস্তাভ ভিগিল্যানের কাজ অনেকটা এমন। স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবতীদের ছড়াছড়ি। পুরো একটি বাগানই তা নিয়ে।

বারসেলোনায় সবচেয়ে ভালো লাগার ব্যাপার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান। প্রথম তেমন গুরুত্ব দিইনি। পরে দেখি এলাহি কাণ্ড। সেদিন ক্রিসমাসের ছুটি হয়ে গেছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কেউ ক্যাম্পাস ছাড়েনি তসলিমাকে শুনবে বলে। প্রফেসররা অপেক্ষা করছিলেন। ছাত্রছাত্রীতে কানায় কানায় পূর্ণ অডিটোরিয়াম। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা। আমার লেখালেখি নিয়ে আলোচনা করলেন চারজন প্রফেসর। এরপর আমার পালা। সামান্য কিছু বললাম। অনুবাদ বিভাগের প্রধান ইংরেজ ভদ্রলোক আমার বক্তব্য ক্যাটালান ভাষায় অনুবাদ করছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কিছু প্রশ্নের উত্তরও দিতে হল। এরপর এল অটোগ্রাফের ধুম। ইতিমধ্যেই হাতে হাতে আমার স্প্যানিশ লজ্জা। আমার ভিড় থেকে একরকম টেনেই বার করে নিলেন প্রফেসররা। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টার ওয়েলকাম তসলিমা। ভূমধ্যসাগরের তীরেও ময়মনসিংহের বাঙাল মেয়েটিকে নিয়ে হৈ চৈ। পৃথিবী কি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে!

স্প্যানিশরা ইংরেজি জানে খুবই কম। সিকিউরিটি পুলিশরা এক অক্ষরও ইংরেজি জানে না। তিন গাড়ি সিকিউরিটি ছিল, বিশাল হোটেলে সিক্রেট রুম ছিল, ঝকঝকে, আস্ত একটি বাড়ি যেন। রুমের সামনে চব্বিশ ঘন্টা নিরাপত্তা প্রহরী। দেখে মায়াই হয় ওদের জন্য। স্পেনে কে আসবে আমাকে মারার জন্য? প্রথম দিন স্পেনের জাতীয়

www.BDeBooks.Com

টেলিভিশনে দীর্ঘ যে লাইভ অনুষ্ঠানটি করেছিল, বারসেলোনায় বসে সরাসরি মাদ্রিদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়েছিল আমাকে, সেই অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। গ্রানাডার ইসলামিক ইউনিভার্সিটির রেক্টর আর স্প্যানিশ বুদ্ধিজীবিরা ছিলেন, ন্যাড়ামাথা মুসলমান আবদুর রহিম মেদিনা বেশ চিৎকার করে ঘোষণা করলেন, মুসলিম ফান্ডামেন্টালিজম বলে জগতে কিছু নেই, সবই ওয়েস্টের বানানো ব্যাপার। সবই কলোনিয়াল ধারণা। গ্রানাডায় প্রচুর মুসলমানের বাস। আমার সন্ধান তারা পেলেও মেরে ফেলার মতো কাজটি করবে কী না আমার জানা নেই।

ক্যাটালান পেন ক্লাব আমাকে ডিনারে ডাকলো একদিন। ক্যাটালান লেখকদের সঙ্গে এক চমৎকার রাত কাটলো। স্ক্যানডিনেভিয়ায় রাতের খাবার খেয়ে নেয় বিকেল পাঁচটায় আর লাঞ্চ এগারোটা বারোটায়। স্পেনে গরম দেশের মতো রাতের খাবার রাতেই খায়। স্পেন আমার কাছে অনেকটা দেশ দেশ লাগে তাই। মানুষগুলোও বেশ আন্তরিক, আমুদে। বারসেলোনায় চেনা গাছপালা, বিশেষ করে খেঁজুর গাছ আর ফনিমনশা দেখে মন ভরে উঠলো, কতদিন দেশের বৃক্ষ দেখা হয় না আমার। চলে আসার আগের দিন রাত দেড়টা অবদি রেস্তোরাঁয় আড্ডা চললো। আমার স্প্যানিশ অনুবাদক দেখতে ধুমসো মতো। বিয়ে করেছে আফ্রিকার মেয়েকে। আমাকে সামারে তার বাড়িতে ওঠার আমন্ত্রণ জানিয়ে বললো, এশিয়া আফ্রিকা আর ইওরোপের তখন মহামিলন হবে। সামারে এসো, নো পুলিশ, নো হোটেল, নো ইন্টারভিউ, নো লেকচার - চমৎকার *মানুষের মতো* জীবন কাটাবে, কী বল?

আসলেই মানুষের মতো জীবন আমার কাটানো হয় না অনেকদিন। ইওরোপে এসেছি সেই আগস্টে। সাধারণ মানুষের মতো হাঁটাচলা আমার হয় না। সবসময় রাজা করে রাখা হয়। আসলে আমি তো নিতান্তই এক নিরীহ প্রজা। আমি তো ডালভাতের মানুষ। শীতকালে ধনেপাতা দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল রাঁধার আবদার করতাম মায়ের কাছে। আমি তো এখনও সেরকমই আছি। মায়ের মুখটি আজকাল বড় মনে ভাসে। পিকাসো তার মায়ের একটি ছবি এঁকেছিলেন সেই বালক বয়সে। পিকাসোর ছবির তলায় তখন সই থাকতো, পাবলো রুইজ পিকাসো। পিকাসো তার মায়ের পদবী। পিকাসো বারসেলোনায় ছিলেন ১৮৯৫ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত। আমার বয়স তখনকার পিকাসোর চেয়ে অনেক বেশি। পিকাসোর মতো আমিও মুগ্ধ হই নিসর্গের সৌন্দর্যে। আমারও পিপাসা মেটে না। পিকাসোর মতো রঙ তুলি নিয়ে আমার বসা হয় না, কিন্তু আমার হৃদয়ে যে ক্যানভাসটি আছে তাতে চোখের কালো রঙ এঁকে যায় জীবন ও জগতের অনেক ছবি।

২.

-কোথায় যাচ্ছ?

-সিসিলি।

-সিসিলি? সিসিলি কেন?

প্রশ্নে এত বিস্ময় থাকে যে আমিও ভড়কে যাই। জগতে কি যাবার জায়গার অভাব পড়েছে? ব্যাপারটি এমন। ইতালিতে যে বেড়াতে যাচ্ছ, তা রোম ফ্লোরেন্স ভেনিস না গিয়ে সিসিলি যাবে প্রথম, এমন বোধহয় কেউ ধারণা করতে পারে না। তবে বলে আশ্বস্ত করি ওদের, যে, না বাপু সিসিলি থেকেই ফিরে আসছি তা নয়, দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকেও যাচ্ছি মানে ওই লেজ বেয়ে মাথায় গিয়ে ওঠার মতো। *ধ্যাত কোনও সভ্য লোক ওখানে যায়? ওই মাফিয়ার দেশে!* বন্ধুরা আমার যাবার দিন সকালেও ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছে, *এইরে আসলেই যাচ্ছিস নাকি?*

-আসলে না তো কি নকলে?

আলিটালিয়া উড়োজাহাজটি পালেরমো বন্দরে ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো আছাড় খেয়ে পড়ে। হুড়মুড় করে নামতে থাকে যাত্রীরা, পোশাক যেন তেন, মাথার চুল মিশমিশে কালো, বাদামি গায়ের রং, হঠাৎ মনে হয় বুঝি দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশে নামছি। বড় আপন আপন লাগে। দীর্ঘদিন সোনালি চুল আর সাদা চামড়া দেখতে দেখতে চোখেরও ক্লান্তি ধরে গেছে। হাঁটছি, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় দুটো ছোকড়া। একজনের মাথার চুল পেছনের দিকে আঁচড়ানো, পরনে জিনসের রংজ্বলা জ্যাকেট, আরেকজনের গায়ে আধময়লা টিসার্ট, তাও আবার ঘাড়ের দিকে ছেঁড়া। বুকের ভেতর দুরুম করে শব্দ হয়, ভরা একটি কলস যেন উপুড় হয়ে পড়ে। মাফিয়ার লোক নয় তো এরা! এমন ত্যাড়া চোখেই বা তাকাচ্ছে কেন? ছোকড়াদুটো ইতালিয় ভাষায় কিছু একটা বলে আমাকে। কে জানে কী বলে! আমি মুহূর্ত না থেমে পাশ কাটিয়ে দ্রুত হেঁটে যাই মানুষের ভিড়ে, ভিড়ে হারিয়ে বুকের ধুকপুক অনেকখানি কাটিয়ে উঠি। একসময় আলগোছে পেছন ফিরে দেখি ঠিক আমার গা ঘেঁসে হাঁটছে ওরা। বিপদ বটে। আমি ডানে গেলে ওরাও ডানে যায়, বাঁয়ে গেলে বাঁয়ে। নিজেকে আড়াল করবার জন্য আমাকে প্রায় ছেলেবেলার লুকোচুরি খেলতে হয়। কিন্তু ও দুটো এতই সেয়ানা যে খপ করে বারবারই আমাকে ধরে ফেলে। মুশকিল আসান বলে একটি কথা আছে, সে সময় দুটো শান্তমতো মেয়ে আমার কাছে প্রায় দৌড়ে আসে, বলে *তোমাকে নিতে এসেছি, আমার নাম আনতোনেলা আর ওর...*

...নাম পরে হবে। আমার পেছনে দুটো বদমাশ লেগেছে, আগে ওদের ছাড়াও, ওরা কী চায় বলো তো! আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলি।

মেয়েদুটো আঁতকে ওঠে। পেছনের ছোকড়াদুটোকে কিছু একটা বলে। আর সঙ্গে সঙ্গেই কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তল বার করে ছোকড়াদুটো ওই ভিড়ের বন্দরে সকলকে চমকে দিয়ে কাউকে খুন করার জন্য এদিক ওদিক দৌড়োতে থাকে। বুঝে পাই না

www.BDeBooks.Com

ঘটছে কী, মেয়েদুটোর গা প্রায় আঁকড়ে ধরে বলি, *দেখ দেখ এদের হাতে পিস্তলও আছে। এরা আমার পেছন পেছন সেই কখন থেকে....*

ওরা হেসে বলে, *এরা তো তোমাকে পাহারা দেবার পুলিশ।*

-পুলিশ? এরা পুলিশ?

আমার বিস্ময় কাটে না। এরা আবার পুলিশ হয় কী করে, একুশ বাইশ বছরের ছোকড়া, ভুস ভুস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে, হাতে পিস্তল নিয়ে দৌড়োচ্ছে। ইওরোপের পাহারা পুলিশ তো প্রায় একবছর ধরে দেখছি, কখনও এমন বেয়ারা বালক তো দেখিনি।

-তা এরা পিস্তল বার করেছে কেন? তখনও আমার উত্তেজনা যায়নি।

-ওই যে বললে দুটো বদমাশ লেগেছে। এরা খুঁজছে ওদের।

বাক্সপেটরা নেবার জন্য মাছের বাজারের ভিড়। তুমুল চিল্লাচিল্লি। সিগারেটের ফিল্টারে, মোচড়ানো কাগজে, থুতুতে বন্দরের মেঝে নোংরা হয়ে আছে। ভাগ্যিস পান বলে কিছু নেই ওদেশে, নয়তো পানের পিকেও লাল হয়ে থাকতো দেয়াল। ধুমপান নিষেধ সাইন আর ডাস্টবিন বলে কিছু নিরীহ জিনিস ঝুলে আছে, লোকে ওদিকে মোটেও ফিরে তাকায় না। ঘন্টা খানিক অপেক্ষা করার পর আমার সুটকেস এল। ভাগ্যিস এল। আমি তো প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। শ্রীলংকার কিছু লোক দেখলাম ওই মাছের বাজারে চিৎকার করছে। প্রচুর তামিল পালিয়ে এসেছে ইতালিতে শুনেছি, সিসিলির দিকেও আসছে। ওরা মাফিয়ায় ভিড়ছে না তো আবার! কারও কারও চেহারা দেখে রীতিমত আশংকা হয়। সুটকেস নিয়ে বাইরে বেরোতে যাবো, কাস্টমসের এক লোকে আমার পথরোধ করে। আচমকা কোত্থেকে ছোকড়া পুলিশদুটো প্রায় উড়ে এসে আমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। পেছনে কাস্টমসের লোকটি খিস্তি শুরু করে। সব খিস্তিরই আলাদা সুর থাকে। ভিন্ন ভাষায় হলেও ঠিকই আন্দাজ করা যায়। পুলিশদুটো সার্ট উঁচু করে কোমরের বেল্টে ঝোলানো আইডি কার্ড দেখায় দূর থেকে, এ যেন লুঙ্গি তুলে নুনু দেখানো। ছোটবেলায় দেখেছি বখাটে ছেলেরা মারামারি লাগলে ওই করে, বিশেষ করে গায়ের জোরে যে জিততে না পারে তার গোপনাঙ্গই ভরসা। আমাকে ছোকড়াদুটোর গাড়িতে উঠতে হবে। কে জানে এরা আসলেই পুলিশের লোক নাকি মাফিয়ার। আনতোনেলাকে বলি, *ভাই তোমরাও চল আমার সঙ্গে। মরলে একসঙ্গেই মরি।*

মেয়েদুটো আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে গেলে ওরা তেড়ে আসে, না আমাকে ছাড়া আর কাউকে তারা গাড়িতে নেবে না। অগত্যা আলাদা গাড়ি করে আসতে হয় বেচারাদের। রাস্তায় অদ্ভুত কাণ্ড করে ছোকড়াদুটো। ট্রাফিক জ্যাম নেই, কিছু নেই, প্যাঁ পুঁ বাজিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দুশ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে যায়। আমি বলি, *তোমরা এভাবে উর্দ্ধশ্বাস ছুটছো কেন? আমার কোনও তাড়া নেই তো!*

কে শোনে কার কথা! ওরা এমনিতে এক অক্ষর ইংরেজি জানে না। আর জানলেও আমার কথায় কান দিত বলে মনে হয় না। গাড়ি ছোটে পাহাড়ের শরীর ঘেঁসে, গাছপালাঘেরা নিবিড় রাস্তা ধরে, গাড়ি ছোটে হোটেলে। আমার জন্য আগে থেকেই

হোটেলের ঘর তৈরি হয়ে আছে। চাবি নিয়ে দোতলায় উঠি। পেছন পেছন আসে ছোকড়াদুটো। জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা মাফিয়ার অবস্থা কী রকম এখন বলো তো? ইংরেজি বাক্যটি না বুঝতে পারলেও মাফিয়া শব্দটি ওরা বোঝে, বুঝে রহস্যময় হাসি হাসে। গড়গড় করে যা বলে, হাত পা নেড়ে যা বোঝাতে চায় কিছুই না বুঝে হেঁটে যাই আমার জন্য বরাদ্দ ঘরটির দিকে। ঘরে আমি ঢোকার আগে ছোকড়াদুটো ঢোকে। হাতে পিস্তল নিয়ে দেয়ালে পিঠ ঘেঁসে হাঁটে, যেন কোনও আততায়ী লুকিয়ে আছে ঘরে, ওদের কাণ্ড দেখে আমার হাসিও পায়, রাগও ধরে। ওরা বাথরুম বারান্দা বিছানার তল আলমারির ভেতর গলা বাড়িয়ে কে জানে কী খোঁজে। ওদের বের করে দরজার সিটকিনি লাগিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মন ভালো হয়ে যায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে যখন তাকাই। সমুদ্রের মধ্য থেকে পাহাড়গুলো এমন লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে যেন এই মেঘ ছোঁবে, চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সের কিশোররা যেমন হঠাৎ লম্বায় বাপ মাকেও ছাড়িয়ে যায় তেমন। অতল এবং অনন্ত কিছুর সামনে দাঁড়ালে কার না মন ভালো হয়! জল ছিটকে এসে একটি জবা ফুলকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, পাথরের ফাঁক থেকে গজিয়ে ওঠা জবা, দেখে আমি চমকে উঠি। কতকাল পর লাল জবার মুখ দেখলাম। এ যে আমার নানির বাড়ি ছাড়া আর কোথাও ফোটে আমার যেন জানাই ছিল না। হুড়মুড় করে স্মৃতি এসে ভিড় করে, আমরা ন্যাংটো বাচ্চারা পুকুরে জবা ফুল ছেড়ে ঢেউ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাঝ পুকুরে ভাসিয়ে দিতাম। কোথায় শৈশব, কোথায় সেই নানিবাড়ির তাল পুকুর! ভূমধ্যসাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কাছ থেকে সব যেন বড় দূরে সরে গেছে, ইচ্ছে করলেও কিছু আর তেমন ছোঁয়া যায় না। বড় জোর হাত বাড়িয়ে চোখের জলটুকুই পারি ছুঁতে।

পুরো একঘন্টা পর মেয়েদুটো ফেরে। আনতোনেলা আর সাব্রিনা। সিসিলি কী এবং কেমন দেখতে এসব নিয়ে ওদের সঙ্গে দীর্ঘ একটি আড্ডা জমে ওঠে।

-ভূমধ্যসাগরে যত দ্বীপ আছে, সবচেয়ে বড় এই সিসিলি।

-তাই নাকি?

-হ্যাঁ দেখতে তিনকোনা বলে গ্রীক আমলে এর নাম ছিল ট্রাইনেকরিয়া।

-আগ্নেয়গিরি ভরা এই দ্বীপটি ভূমিকম্পেও ভুগেছে কম নয়। এই শতকেই দুদুবার ধ্বসে গেছে অনেকখানি।

-ভুগেছে ভিনদেশিদের শাসনে। গ্রীক, স্যারাসেন্স, রোমান, বাইজানটিন, নরম্যান.. তারপর ধরো স্প্যানিশ।

-স্প্যানিশরা কবছর ছিল?

-বিশ্বাস হয়তো করবে না, তিনশ বছরের বেশি।

-সেদিক থেকে আমরা কিছুটা ভাগ্যবান। ব্রিটিশ আমাকে দুশ বছর জ্বালিয়েছে। সিসিলিয়ান ভেসপার্স বলে একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। ঘটনাটি কি বলো তো!

আমি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ইভ সাঁ লরোঁর মেনথলে আগুন ধরাই। আনতোনেলা হেসে ওঠে। সাব্রিনাও। দুজনই হই হই করে বলতে শুরু করে। ঘটনাটি থার্টিন্থ

www.BDeBooks.Com

সেনচুরির, সেইন্ট লুইএর ভাই সার্লস ওয়ান তখন পোপের আস্কারা পেয়ে সিসিলি শাসন করতে এসেছে। সিসিলিয়ানরা কিন্তু ওকে দুচোখে দেখতে পেত না। সিসিলিয়ানরা, ফরাসিদের, যারা ইতালিয় ভাষা বলতে তোতলাতো, নাম দিয়েছিল *তার্তাগ্লিওনি*, মানে তোতলা। ইস্টারের পর এক সোমবার হঠাৎ গির্জার ঘন্টা বেজে ওঠে। কজন ফরাসি সান্তো স্পিরিতো গির্জায় পালেরমোর এক মেয়েকে অপমান করেছিল। সিসিলিয়ানরা এ ঘটনায় ক্ষেপে ফরাসিদের সেদিন একেবারে ম্যাসাকার করে ছাড়ে। *গভর্নরএর বাড়িও ঘেরাও করে।*

-বাহ! সিসিলিয়ানরা বেশ সাহসী বটে।

-নিশ্চয় নিশ্চয়। আনতোনেলা চিবুক উঁচু করে বলে।

আনতোনেলা আর সাব্রিনা বিছানায় বসে, কখনও কাত হয়ে, শুয়ে, সিসিলির ভালোমন্দের ব্যাখ্যা দেয়। ওদের চোখের তারায় খেলা করে সিসিলি নামের এই দ্বীপটির জন্য এক আশ্চর্য ভালোবাসা। আসলে সিসিলি ইতালির আত্মীয় হয়েও যেন কেউ নয়। যেন একলা একটি দুঃখিনি দেশ। আর আনতোনেলার শান্ত অথচ উজ্জ্বল দুটো চোখে মুগ্ধ তাকিয়ে থাকি।

সাব্রিনা তাড়া লাগায় - চল চল।

রাতের নিমন্ত্রণে যাবার সময় হয়ে গেছে। ক্ষিধে তেমন না লাগলেও সিসিলিয়ানদের বাড়ি ঘর কেমন হয়, আঙিনায় ফুল কেমন ফোটে তা দেখবার ইচ্ছেয় রওনা হই। লা মনডেলায় টুরিস্টদের ভিড়, ফুটপাতে নানা জিনিসপাতি নিয়ে বসে গেছে গরিব সিসিলিয়ানরা। সোনালি চুলের নারীপুরুষ কোমর জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওইসব জিনিসের দিকে কী বড় একটা থামে। আমার তো মনে হয় না। ওরা আসে আসলে রঙ বদলাতে। আজকাল এক ফ্যাশন হয়েছে, গ্রীষ্মকালে গায়ের রং তামাটে করা। একসময় গায়ের সাদা রং টিকিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত হত ইওরোপীয়রা, কারণ গরিব জেলে বা কৃষকদের রং ছিল তামাটে, যারা রোদে পুড়ে বাইরে কাজ করত। আর এখন গরমে গায়ের রং তামাটে হওয়া মানে খুব টাকাওয়ালা বলে গণ্য হওয়া। টাকা থাকলে লোকে ছুটিতে বিদেশে যায়, সমুদ্রের ধারে সূর্যস্নান করে তামাটে বানায়। ইওরোপে এখন গরমকালে তামাটে রং শো করবার অদ্ভুত ফ্যাশন চলছে।

যে বাড়িতে আমাদের গাড়ি থামে সেটি আস্ত একটি বাগানবাড়ি। এ বাড়িতে এক মধ্যবয়সী ইংরেজ ভদ্রমহিলা পনেরো বছর ধরে সিসিলিয়ান স্বামী নিয়ে সংসার করছেন। বাড়ি দেখেই অনুমান হয় এদের টাকা পয়সা প্রচুর। সিসিলিতে টাকা পয়সা যাদের আছে মাফিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই, এ কথা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আমি অস্থির পায়চারি করি ঘরে বাগানে বারান্দায়।

আনতোনেলা বলে - *জল টল কিছু খাবে? নাকি ওয়াইন দেব?*

-না। আমি খাবো না কিছু।

-শরীর খারাপ লাগছে কি?

-না।

লিন্ডা কাছে এসে হেসে বলে - *এই তো খাবার আর পাঁচ মিনিট লাগবে মাত্র তৈরি হতে।*

আমি ম্লান মুখে হাসি। একসময় সোফায় গা এলিয়ে সাদামাটা গল্প শুরু করি আবহাওয়া বেশ চমৎকার ইতালির, সুইডেনে এখন বরফ পড়ছে, সুইডিশরা বলে গত একশ বছরে এমন কাণ্ড ঘটেনি, মে মাসে তুষার পড়েনি.. ইতালির ভাষায় হ্যালো বা গুড বাই হচ্ছে চাও চাও.. এটি এখন আন্তর্জাতিক সম্ভাষণ.. শব্দটির উৎপত্তি চিয়াভো থেকে। চিঁয়াভো থেকে চিয়াও। চিয়াও থেকে চাও। চিয়াভো মানে আমি তোমার চাকর। কজন জানে চাও শব্দের আসল অর্থ? ঠা ঠা করে হেসে উঠি আমি।

আসল কথা পাড়ি, *তা ইংলেন্ডে না থেকে সিসিলিতে থাকছেন কেন লিন্ডা?*

-*সিসিলির প্রেমে পড়ে গেছি যে।* লিন্ডা বোকা চোখে তাকিয়ে থাকেন। প্রেমে পড়লে মানুষকে আসলে বোকাই দেখায়।

-*সিসিলির প্রেমে কি কেউ পড়ে! যেমন মাফিয়া এখানে..*

আমার কথা শেষ হয় না। লক্ষ করি ঘরের মধ্যে আশ্চর্য স্তব্ধতা নেমে এসেছে হঠাৎ। সাব্রিনা কলকল করে কথা কইছিল, সেও ঠাণ্ডা মেরে গেছে। লিন্ডাও আমার প্রশ্নের উত্তর দেন না। আন্দ্রিয়ানো, লিন্ডার স্বামী আচমকা চেয়ার ঠেলে উঠে যান। আনতোনেলাকে দেখি নখ খুঁটছে। রুদলাফো আর বারবারা, অ্যামনেস্টির দুজন সদস্য, পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। ঘটনাটি কী, মাফিয়ার কথায় এরা এমন গুটিয়ে নিল কেন নিজেদের!

আন্দ্রিয়ানো বড় বড় থালায় করে পিৎজা নিয়ে উপস্থিত হন। নানান ধরনের পিৎজা, সকলে অল্প অল্প করে পিৎজা প্রসঙ্গে মুখ খুলতে থাকে। যেমন খুব স্বাদের হয়েছে, বানালো কে এত পিৎজা। আমি দুএক কামড় খেয়ে বলি- *নাইনটিন্থ সেনচুরিতে মাফিয়ার শুরু এই সিসিলিতে। প্রথম দিকে গ্রামে ছিল এই প্রবণতা। এখন শহরে, তাই না?*

কেউ হ্যাঁ বা না কিছু বলে না।

আন্দ্রিয়ানো বলেন, *পিৎজা ভালো লাগছে তো খেতে?*

-*হ্যাঁ তা লাগছে। ভাবছিলাম জজ ফালকোনের কথা। শুনেছি মাফিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করে গেছেন। ফালকোনে, তাঁর স্ত্রী আর দুজন পুলিশকে যাঁরা তাঁর গাড়িতে ছিল, তো শেষ পর্যন্ত মাফিয়ার লোকেরা মেরে ফেলেছে। ফালকোনেকে মারার কমাস পর আরেকজন জজ, কী নাম যেন, বোরসেলিনো, ওঁকেও তো মেরে ফেললো। বোরসেলিনো তাঁর মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, তাই না? আচ্ছা, ফালকোনে মাফিয়া নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন শুনেছি। আমার খুব পড়ার ইচ্ছে। এর কি কোনও ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে?*

আন্দ্রিয়ানোর চোখের দিকে সোজা তাকিয়েই প্রশ্নটি করি। চোখ নামিয়ে আন্দ্রিয়ানো ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়েন। বলেন *খুব গরম পড়েছে আজ। তোমাদের দেশ তো গরমের দেশ। নিশ্চয়ই তোমার খুব অসুবিধে হবে না এই গরমে। কী বল?*

-*না তা অসুবিধে হচ্ছে না।*

www.BDeBooks.Com

ফালকোনের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে কী না এ ব্যাপারে কেউ কোনও কথা বললো না কেন? আমার বড় অস্বস্তি হতে থাকে। তবে কি যা ধারণা করেছি যে এই লোক মাফিয়ার লোক, তাই সত্য! আর সত্য হলে আনতোনেলা আমাকে এ বাড়িতে আনলো কেন? সিসিলিয়ানদের বিত্ত দেখাতে! হারে বোকা। বিত্ত আমার ঢের দেখা হয়েছে। এসব চকমকিতে আমার মন ভরে না। তখনও সবার খাওয়া শেষ হয়নি। আনতোনেলাকে বলি চল এবার।

-কী বল, এক্ষুনি কী যাবে!

লিভা গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকে।

সকলকে শুকনো গ্রাৎসে বলে বেরিয়ে পড়ি। পুলিশদুটো আঙুলে পিস্তল ঘোরাতে ঘোরাতে গাড়ির দিকে যায়, পেছন পেছন আমি আর আনতোনেলা হাঁটি। আনতোনেলা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, *তুমি কি আন্দ্রিয়ানোকে সন্দেহ করছো?*

-হ্যাঁ করছি। আমার সোজা সাপটা উত্তর।

আমার একটি হাত চেপে ধরে আনতোনেলা। বলে, *আন্দ্রিয়ানো ভালো লোক। ও মাফিয়ার নয়। তবে যে হোটেলে আছো। সেটি খবর পেলাম মাফিয়ার...*

প্রায় চেঁচিয়ে উঠি।- *বল কী?*

-হ্যাঁ কী করবো বলো, আগে তো জানিনি আমরা।

-এর কোনও মানে হয়? অন্য হোটেলের ব্যবস্থা কর এখনই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনতোনেলা বলে, *অন্য হোটেল যে মাফিয়ার নয়, তাও বা বুঝবো কী করে! তবে কথা দিচ্ছি, কালই হোটেল বদলাবো। আর রাতটা কোনওমতে কাটাও।*

হোটেলে পৌঁছে আমার গা ছমছম করে ভয়ে। রিসেপসোনিস্টের দিকে তাকিয়ে গলা শুকিয়ে যায়। নিঃশব্দে নিজের ঘরে উঠে আসি। যারা এই হোটেলে আছে, তারা কী জানে হোটেলটি মাফিয়ার! তারা কি জানে প্রতিবছর দুশ মতো লোক খুন মাফিয়ায়! তারা কি জানে ড্রাগ চালান, নারী চালান, অস্ত্র চালান, অপহরণ- অবৈধ সব কাজগুলো অবাধে করে যাচ্ছে এরা! সম্ভবত এই হোটেলের কোনও কোনও ঘরেই এদের সভা হয়, মানুষ মারার নীল নকশা তৈরি হয়! সারারাত আমার ঘুম আসে না। ভূমধ্যসাগরের কান্নার শব্দ শুনি সারারাত।

সকালে মেয়েদুটো এসে আমাকে নিয়ে যায় শহর দেখাতে। ঘন বসতি থেকে থেকে, পলেস্তারা খসে পড়া ভাঙাচোরা দালান- ওর ঘুপচি ঘরগুলোও মানুষের বাস। সাব্রিনা ঠোঁট উল্টে বলে সারা শহরে পাইপে জলও আসে না দুদিন চারদিন। এ যে ইওরোপের কোনও দেশ আমার বিশ্বাস হতে চায় না। নোংরা বস্তি পেরিয়ে শহরের বড় রাস্তায় গাড়ি চলে। ব্যাংকগুলোর সামনে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ। ট্রিগারে হাত রেখে। ইওরোপের আর কোনও দেশে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি। আর কোনও দেশের রাস্তায় লোকের হাতে হাতে এত কর্ডলেস ফোন আর ব্রিফকেস দেখিনি। ফোনে মানুষগুলো কার সঙ্গে কথা বলে! ব্রিফকেস নিয়েই বা দৌড়োয় কোথায়! মাফিয়ার লোক নয় তো! পিসযো কামিয়ে কার সঙ্গে কথা বলে! পিসযো হচ্ছে চাঁদা দেওয়ার

নিয়ম, প্রায় প্রতিটি দোকান আর রেস্তোরাঁর মালিককে মাসে মাসে চাঁদা দিতে হয় মাফিয়ার লোকদের, না দিলে যে কোনও সময় বোমা মেরে দোকান উড়িয়ে দেয় ওরা।

চমৎকার একটি থিয়েটারের সামনে গাড়ি থামে। আনতোলেনা বলে -এটি হচ্ছে সিসিলির সবচেয়ে বড় থিয়েটার, মাসিমো থিয়েটার। এর রেস্টোরেশনের কাজ শুরু হয়েছে পচাত্তর সালে, আজও কাজ শেষ হয়নি। তুমি তো তোমার দেশের লজ্জা নিয়ে বই লিখেছো। আমাদের সিসিলির অনেক লজ্জা, এটি একটি, যে, কুড়ি বছরেও একটি থিয়েটারের রেস্টোরেশন হয় না।

সারা সিসিলি জুড়ে দালানকোঠায় নরম্যান আর্কিটেকচার, লাইমস্টোনে গড়া গ্রীকদের দৌড়িক টেম্পল ঘোড়ার খুড়ের মতো আর্চ, দেয়ালে বাইজানটিনদের সোনালি মোজাইক। সাব্রিনা বলে, কেবল শিল্প আর স্থাপত্য নয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, দৈনন্দিন জীবনেও ওরা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে গেছে।

-কী রকম শুনি?

তা আর শোনা হয় না। পিয়াৎসা প্রেতোরিয়া, পিয়াৎসা বোলিনি হয়ে লা মারতোরানা গির্জার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ওই প্রভাব ট্রভাবের কথা দিব্যি ভুলে যাই। সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজারের এক অ্যাডমিরাল বানিয়েছিলেন গির্জা, ১১৪৩এ। সোনালি বাইজানটিন- মোজাইকের কাজ দেখে অবাক হতে হয়। তখনকার পেইনটিংএ রাজাদের বাঁধা শিল্পীরা যেমন যিশু কিম্বা মেরির পায়ের কাছে রাজা এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের আঁকতো, এই গির্জাতেও দেখি দেয়াল জুড়ে মোজাইক সাজিয়ে বাইবেলের গল্প বলতে গিয়ে এক জায়গায় স্বয়ং যিশু মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন দ্বিতীয় রজারকে, আর অ্যাডমিরাল মেরির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। সিসিলিতে দেখার মতো গির্জা একটি দুটি নয়, অনেক। ধর্মের দালানকোঠা দেখতে যাওয়ার পেছনে কোনও ধর্মানুভূতি আমার ভেতর কাজ করে না, পুরোনো স্থাপত্য এবং ভেতরের চমৎকার শিল্প দেখার ইচ্ছেতেই যাওয়া। দ্বাদশ শতাব্দির সান ক্যাতালদো গির্জার মুরিশ শিল্প আর স্থাপত্য-কাজ কেন দেখতে ইচ্ছে করবে না! টই টই করে গির্জা থেকে গির্জা ঘুরে বেড়াই। গোগ্রাসে গিলি সৌন্দর্য। ক্যাথিড্রাল, ইতালিরা বলে ক্যাত্তিদ্রালে, এটিও দ্বাদশ শতাব্দির, সিসিলিয়ান-নরম্যান স্টাইলে গড়া। ভেতরে রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আর হুহেনস্টাউফেন, অ্যানগেভিন শাসকদের কবর। হুহেনস্টাউফেন গথিক স্টাইল নিয়ে আসে সিসিলিতে। সাব্রিনাতে জিজ্ঞেস করি, কোন শতকে বল তো!

-তেরো।

শান্ত কণ্ঠে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের মতো উত্তর করে সাব্রিনা।

সেইন্ট জনের গির্জা আরবীয় স্থাপত্যের। ভেতরের বাইবেলের গল্পের পাত্রপাত্রীদের পোশাকও আরবীয়। পশ্চিমিরা ভূমধ্যঅঞ্চলের যিশু মেরিকে আঁকতে গিয়ে মাথায় বসায় সোনালি চুল আর চোখের রং করে নীল, ওঁদের রীতিমত *পশ্চিমি* বানিয়ে ছাড়ে। ওসব দেখে দেখে হঠাৎ ভিন্ন পোশাকে ভিন্ন চেহারায় নাদুশ নুদুশ দুম্বার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যিশুকে দেখে খটকা লাগে। কেবল গির্জা নয়, ক্যাপুচিন ক্যাটাকম্ব দেখতে ছুটে যাই। চমৎকার জায়গা। প্রায় আট হাজার মমি সতেরো থেকে উনিশ শতাব্দি অবদি

www.BDeBooks.Com

ছিল এখানে। মমিগুলো খুব গরম হাওয়ায় রাখা হত। এরপর ছোট দেখতে মধ্যযুগের আঁকা ছবি আর ভাস্কর্য সাজানো ক্যাটালান-গথিক স্টাইলের রিজিওনাল গ্যালারিতে। ছোট দেখতে মিউজিও আরকিওলজিকো, পালাৎযো দ্য নরম্যানি। নরম্যানির প্রাসাদে এখন লোকাল পার্লামেন্ট বসে। বিশাল দুর্গ, গম্বুজ সবই নরম্যানের সময়কার, নরম্যানের সিসিলি দখল ১০৭২এ, এরপর রাজা দ্বিতীয়-রজার প্রাসাদের নিচতলা বানান আরবীয় ধাঁচে ১১৩০ থেকে ১১৪০ অবদি। দশটি প্রাচীন থামের ওপর ঘোড়ার খুড়ের আকারের আর্চ। ভীষণ দেখতে। দেয়ালে, ডোমে মোজাইকের কাজ এত চমৎকার যে চোখের দেখায় আশ মেটে না. ইচ্ছে করে সারাদিন ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে ওখানে বসে থাকি। দোতলায় রাজা দ্বিতীয় রজারের ঘরে মোজাইকে দাবার ছক। রাজা কি দাবা খেলতে ভালোবাসতেন? বোধহয়। ইওরোপের রাজাবাদশারা শিল্প স্থাপত্যের কদর করে আমাদের বেশ সুবিধেই করে গেছেন। তা নাহলে কোথায় পেতাম এত বিচিত্র পেইনটিং, মোজাইক, ভাস্কর্য, স্থাপত্য!

পালেরমোর নামকরা কোনকা দোরো আর নেই। ঠিক পাহাড় আর সমুদ্রের ধারে লেবু আর কমলালেবুর অরণ্যের নাম ছিল কোনকা দোরো। বাংলা করলে দাঁড়ায় সোনালি শঙ্খ। লেবু আর কমলালেবু গজিয়ে সোনালি হয়ে থাকতো পুরো এলাকা। এখন সোনালি শঙ্খে ধনী সিসিলিয়ানরা বাড়ি তুলে বসত শুরু করেছে। এত জায়গা থাকতে কোনকা দোরোয় কেন! সম্ভবত জায়গাটি বরাবরই আকর্ষণীয় ছিল বলে মানুষ নেমে কমলালেবুর চাষ চালান করে দিয়েছে অন্য কোথাও। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় কোনকা দোরোয় মাফিয়ার লোকেরা থাকে। এ নিয়ে আর আনতোনেলাকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কোনকা দোরো নেই, তবে পুরোনো সেই ঘোড়ার গাড়ি এখনও আছে। ঘোড়ার মাথায় রঙিন মুকুট পরিয়ে ঘোড়াকে নানা রঙে সাজিয়ে এখনও সিসিলিয়ানরা দাদার আমলের ঐতিহ্যটি রক্ষা করে চলেছে। টিনের তৈরি সৈন্য সামন্তও ঝোলে দোকানে। হাতে তলোয়ার আর ঢাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক একখানা বিজয়ী সেনাপতি যেন। কোন যুদ্ধের সৈন্য এরা কে জানে। যুদ্ধ তো কম হয়নি এ দেশে।

আনতোনেলা আমাকে পাহাড়ের ওপর পাথর কেটে বানানো গির্জাটি দেখাতে নেয়। একসময় এই সিসিলিতে মহামারি শুরু হয়। প্লেগ রোগে লক্ষ লোক মারা যায়। গির্জার এক দেবদাসি সিসিলির মানুষকে সেসময় প্লেগের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল কী এক ওষুধ খাইয়ে। এখন গির্জায় সেই দেবদাসির মূর্তির পায়ের কাছে মানুষ টাকা পয়সা গয়নাগাটি ইত্যাদি ফেলে যায়। অসুখে বিসুখে এখনও মানুষের ভরসা এই দেবদাসি। অ্যালুমিনিয়ামের খেলনা হাত পা বিক্রি হয় গির্জার বাইরে। যার পায়ে অসুখ, সে একটি অ্যালুমিনিয়ামের পা কিনে মূর্তির সামনে রেখে আসে, মনে বিশ্বাস নিয়ে যে দেবদাসি ভগবানকে বলে কইয়ে রোগ সারিয়ে দেবে। কুসংস্কার কি কেবল ভারত বাংলাদেশেই!

পাহাড়ের চুড়ো থেকে সমুদ্রের নীল জল, জলের জেলে নৌকো, জলপাইএর পাতার মতো- দেখে আমার মন ভালো হয়ে যায়। আজকাল পালেরমোতে ফরাসি পর্যটকরা আসে। মেয়েরা বিকিনি পরে ভূমধ্যসাগরে স্নানে নামে। কেউ কেউ বিকিনি

খুলে পুরো ন্যাংটো হয়ে শুয়ে রোদ তাপায়। আমি রোদে পোড়া মানুষ। রোদ তাপাবার পর্যটক নই। এসেছি মানুষ দেখতে। জীবন দেখতে মানুষের। কখনও মন খারাপ হলে জলপাই গাছের ছায়ায় শুয়ে আকাশ দেখতেও।

দুপুরে আরেক অ্যামনেস্টি সদস্য মাসিমোদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখি মাসিমোরা অনেকগুলো ভাইবোন, চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স, বাবা মায়ের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে। ইওরোপে কোথাও এমন দেখিনি। পনেরো ষোলো বছর বয়সে ছেলে মেয়েরা বাপ মা থেকে আলাদা হয়ে যায় কিন্তু এই সিসিলিতে আলাদা হয় বিয়ের পর। আর খাবারে সাধাসাধি করবার ব্যাপারটিও ইওরোপের অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। এরা করে। দুপুরে এদের নিয়ম পাস্তা খাওয়া, রাতে পিৎজা আর মাছ। এক দুপুরেই বাড়ির সবাই মিলে পাস্তা পিৎজা মাছ রেঁধে আনলো, বেড়ে দিল পাতে। একেবারে মায়ের আদর। এরা মাছে জলপাই তেল ঢেলে খায়। যে তেল আমরা গায়ে মাখি, তা দিয়ে এরা তরকারি রাঁধে, মাছমাংসে মাখে। আমার মাকে সয়াবিনের বদলে জলপাই তেল দিয়ে মাছ রাঁধতে বললে মা নির্ঘাত মুর্ছা যাবেন। মা এ শুনেও মুর্ছা যাবেন নিশ্চয়ই যে তাঁর কন্যা এখন শামুক, কাঁকড়া, হাঙর, অক্টোপাস খায়।

মাফিয়ার প্রসঙ্গ আমি না ওঠালেও এমনিতেই ওঠে। মাফিয়া নিয়ে টেলিভিশনের এক সিরিজ লা পিওভারার কথা পাড়ে মাসিমো, ইংরেজিতে এর অর্থ হচ্ছে অক্টোপাস। অক্টোপাস যেমন হাত পা বাড়িয়ে কিছুকে গ্রাস করে, মাফিয়া তেমন সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার মাফিয়া ছড়িয়েছে, আরও কত জায়গায় যে ছড়াবে কে জানে।

আনতোনেলা বলে, *ইতালির ভিন্ন জায়গায় মাফিয়ার এখন ভিন্ন নাম। সিসিলির কাছে ক্যালাব্রিয়ায় এর নাম অ্যানদ্রেনঘেতা, সারদেনগায় এর নাম অ্যানোনিমা সারদা, আর পাদোভায় এর নাম মাফিয়া দেল বেনতা।*

যে প্রশ্নটি আমার মনে প্রথম থেকেই জাগছে, সেটি শেষ অবদি করেই বসি আনতোনেলাকে। মাফিয়া কেন ইতালির দক্ষিণে, কেন উত্তরে নয়?

আনতোনেলা বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকায়। সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে। কারণ উত্তর-ইতালির মতো দক্ষিণ ইতালি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড নয়। এখানে মানুষ গরিব। চাকরি বাকরি নেই। মাফিয়ার লোকেরা সহজে তাই লোক পায় দলে টানার। ওরা পয়সা আর কাজের গ্যারেন্টি দেয় লোকদের। লোক এখন মাফিয়ায় না ভিড়ে করবে কী! মাফিয়া তাই জমজমাট এখানে।

মাসিমোর দু বোন প্যাট্রিচিয়া আর ভ্যালেনটিনা ইতালিয় ভাষায় বেশ ধমকের সুরে কিছু বলে। সম্ভবত মাফিয়ার গল্প ওদের পছন্দ নয়। আনতোনেলা চুপ হয়ে যায়। চায়ের কাপে নিঃশব্দে চুমুক দিই। লক্ষ করি মাসিমোর ভাই লিওনার্দো কিছু বলতে চাইছে, ওর ইংরেজি তেমন ভালো নয়। সাব্রিনা অনুবাদ করে শোনায়। ও বলছে - *সকলে ভাবে সিসিলির সব লোকই বুঝি মাফিয়ায় জড়িত। আসলে কেউ জানে না*

www.BDeBooks.Com

আমরা সাধারণ মানুষ কী ভীষণ লড়ছি মাফিয়ার বিরুদ্ধে। সরকারের মধ্যেই, মেয়র বল, কমিশনার বল, মাফিয়ার লোক। যাব কোথায় আমরা বল।

মাসিমোর বাবা আদামো কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে ভাঙা ইংরেজিতে বলেন, *তুমি কি ভয় পাচ্ছো ওই হোটেলে থাকতে? শুনেছি সব আমি। ভেবো না, আমার এই বাড়িতেই বাকি দিনগুলো না হয় থাকো। তোমাকে পেলে আমাদেরও বড় আনন্দ হবে।*

সন্ধে হয়ে এল। টাউন হলে অ্যামনেস্টির সভা, বক্তৃতা করতে যেতে হবে। বক্তৃতা করতে আমার মোটেও ইচ্ছে হয় না। তবু কী আর করা! অনুরোধে অনেকটা ঢেঁকি গেলার মতো অবস্থা আমার। ফ্রানচেসকা নামের নতুন মেয়ে-পুলিশ এসেছে সন্ধের শিফটে। সেও ওরকম পিস্তল ঘোরানো মেয়ে। অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা ছটায়, শুরু হয় সাতটা পাঁচে। যেন বাংলাদেশের নিয়ম। ক্লাওদিয়া, ক্লার‍্যালেনটিনা আর আমি নারী স্বাধীনতা নিয়ে গুরু গম্ভীর আলোচনায় মেতে উঠি, দর্শকরাও উত্তেজিত। দর্শকের সারিতে এরেসি, পাওলো, সামান্থা, এলিজাবেথা, আলেকজান্দ্রা, মাসিমো যাদের সঙ্গে এর মধ্যে আলাপ হয়েছে, সকলকে দেখি।

এক ফাঁকে সাব্রিনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি, *আনতোনেলাকে দেখছি না যে!*

সাব্রিনা বলে, *ওর একটু জরুরি কাজ পড়েছে। বাড়ি গেছে।*

ব্যাপারটি আমার কাছে অদ্ভুতই ঠেকে। এই অনুষ্ঠানের জন্য আনতোনেলা দিনরাত খেটেছে। পোস্টার সেঁটেছে দেয়ালে দেয়ালে, আমন্ত্রণ পত্র বিলি করেছে। অনুষ্ঠানটিতে ওর সভানেত্রী হওয়ার কথা।

আসলেই কি বাড়ির জরুরি কাজ নাকি অন্য কিছু!

অনুষ্ঠান শেষে সাব্রিনাকে আবার ধরি- *কী, আনতোনেলা ফিরেছে?*

সাব্রিনা বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ে- *ফেরেনি।*

অ্যামনেস্টির দল সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে নিয়ে তারা রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে। কিন্তু যে মেয়েটি আমার সঙ্গে সারাদিন কাটিয়েছে, সে আকস্মিক ভাবে অনুপস্থিত থাকবে, আমার মন এতে সায় দেয় না। কার সঙ্গে কী গোল বাঁধলো কে জানে। আমার বড় রাগই ধরে। ইওরোপের এইসব সভ্য সংগঠনগুলোর ভেতরে ভেতরে যে কত অসভ্য ব্যাপার থাকে, তা এতদিনে কিছুটা বুঝেছিও বটে। আমাকে বিষণ্ণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাব্রিনা কাছে আসে। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে সামনে।

কিছু বলবে? বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি।

সাব্রিনা নিচু গলায় বলে, *আনতোনেলার ভাইএর বউ বাচ্চাদের মেরে ফেলেছে মাফিয়ার লোকেরা, ঘন্টা দুই আগে। আমরা দুএকজন ছাড়া ব্যাপারটি কেউ জানে না।*

কেউ যেন আচমকা পেটে ছুরি বসিয়ে দিল এমন মনে হয়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয় আমার। বলি, *বলছো কী তুমি?*

-স্টেফানো, আনতোনেলার ভাই, মাফিয়ার লোক ছিল। কমাস হল পুলিশে ধরেছে। জেলে এখন। সে ঠিক করেছিল বিচারকদের জানিয়ে দেবে মাফিয়া সম্পর্কে যা সে জানে। খবরটি ওরা জেনে ওর বউ বাচ্চাদের খুন করে বিশ্বাসঘাতকতার শোধ নিয়েছে।

সাব্রিনা নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথাগুলো বলে। যেন এরকম খুন টুন এখানে ডালভাত। সয়ে গেছে এদের সব। প্রায়ই আত্মীয় কিম্বা চেনা পরিচিতদের মৃত্যুর খবর পায় বলেই কী না কে জানে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি দেয়ালে হেলান দিয়ে। রেস্তোরাঁয় যাবার বা হোটেলে ফিরবার কোনও তাড়া দেখি না নিজের মধ্যে। আনতোনেলা বলেছিল আজ হোটেল বদলাবে। কী লাভ হোটেল বদলিয়ে! কাল সকালেই তো চলে যাব রোম। সাব্রিনাকে খুঁটি নাটি বিষয়গুলো, কী করে মারলো, কখন মারলো, বাচ্চাদের বয়স কত ছিল, আনতোনেলার বাবা মা করছে কী এখন, স্টেফানই বা কী বলছে, খুনীদের ধরা পড়বার কোনও লক্ষণ আছে কী না, কিছু জিজ্ঞেস করি না। কী লাভ জিজ্ঞেস করে। যারা গেল, তারা তো জন্মের মতোই গেল।

ফ্রানসেসকা পিস্তল হাতে নিয়ে সামনে আসে। বলে - *চল চল, রেস্তোরাঁয় যাবে।*

-আমি কোথাও যাবো না। আর অত পিস্তল হাতে নিয়ে ঘোরো না তো! আমার দেখতে ভালো লাগে না।

আমি রীতিমতো ধমকে উঠি। এদেরই বা বিশ্বাস কী! যে কোনও সময়, আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমাকেই কিডনাপ করে বসতে পারে। পুলিশের মধ্যে মাফিয়ার লোক নেই তা কে বলবে!

সারারাত আমি কোথাও ফিরি না। রাস্তায় এলোমেলো হাঁটি। সাব্রিনাও হাঁটে আমার সঙ্গে। কখনও কোনও স্কোয়ারে কোনও স্ট্যাচুর বেদিতে শুই, সাব্রিনাও পাশে শোয়। ভোরবেলা ও হোটেল থেকে আমার সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে আসে। কারও সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সাব্রিনাকে যে শেষ কথা বলবো ভালো থেকো, তাও বলি না। ওর জন্য, আনতোনেলার জন্য, সিসিলির সবার জন্য আমার মায়া হতে থাকে আমার।

এই লেখাটা লিখেছিলাম নিখিল সরকারের অনুরোধে।

বলেছিলেন, *এত যে দেশ ভ্রমণ করছো, এত যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কিছুই তো লিখছো না!*

-লিখতে ইচ্ছে করে না। নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর আমার।

-লেখার চেষ্টা করো। লেখালেখির জন্য দেশ ছাড়তে হল। আর নির্বাসনে গিয়ে লেখাই যদি বন্ধ করে দাও, তবে বাঁচবে কী করে! লেখাই তোমাকে বাঁচাবে। লিখতে তোমাকে হবেই।

-লেখাটেখা আমার দ্বারা আর হবে না।

-হবে না বুঝলে কী করে। ছোট হলেও কিছু লেখ। এর মধ্যে কোথাও গেলে?

www.BDeBooks.Com

-সিসিলি থেকে এই এলাম।

-সিসিলি নিয়েই লেখ না।

-এ নিয়ে লেখার কিছু নেই। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অনুষ্ঠান ছিল। .. গেলাম। বক্তৃতা করলাম। ঘুরলাম। এই দেখলাম। সেই দেখলাম। চলে এলাম। এসব লেখার কী আছে! তাছাড়া মাফিয়ার দেশ নিয়ে তো কাব্য করার কিছু নেই।

-এসবই লেখ। যদি এর মধ্যে সামান্য কল্পনা মেশাও, তাহলে বেশ মজাদার একটি লেখাও হতে পারে। গল্পের মতো।

-আমি কল্পনা মেশাতে পারি না। কল্পনা শক্তি আমার কম বলেই উপন্যাস লিখতে পারি না।

-মাফিয়া নিয়েই সামান্য কল্পনা যোগ করে তোমার ভ্রমণের ওপর একটি লেখা তৈরি করে ফেলো। নিখিল সরকার বললেন।

-লিখলাম। পাঠালাম। তিনি বললেন, *সবই তো সত্যি মনে হচ্ছে। কল্পনা তবে কোথায়?*

ম্লান কণ্ঠে বললাম, *শেষের দিকটা ঠিক ওরকম ছিল না। আনতোনেলা বিমানবন্দরে এসেছিল। গালে আমার চুমু খেয়ে বলেছে, তুমি চলে যাচ্ছো, খুব খারাপ লাগছে। আবার আসবে তো? ভুলে যাবে না তো?*

৩.

হারিয়ে যাওয়া একটি চিঠি যদি হঠাৎ করে চোখে পড়ে! চিঠিটি নিয়ে বসে থাকি অনেকক্ষণ। চিঠিটি তখন আর চিঠি নয়। চিঠি হয়ে পড়ে ছবির মতোন কিছু। তেমন একটি চিঠি, অসম্পূর্ণ চিঠি কাগজের জঙ্গল থেকে মেলে। চিঠিটি এমন-

কতকিছু ঘটছে, আপনাকে কিছুই জানানো হচ্ছে না। ডিএইচএলে দুমাসে দু পাতা চিঠি পাঠিয়ে জীবনের সবকিছু জানানো যায় না। আর ফোন ফ্যাক্সে দেখেছি লক্ষ টাকা খরচা হয়, কাজের কাজ কিছু হয় না। অকাজই কিন্তু আমার আসল কাজ। আপনার সঙ্গে আমার অন্তরের যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি, আর আপনার সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে সবচেয়ে কম। কতবার যে ইচ্ছে হয়েছে আপনাকে তুলে নিয়ে এসে পুরো জগত ঘুরি, কিন্তু যেভাবে বটবৃক্ষের মতো শেকড় গেড়েছেন শহর কলকাতায়..!

এখন আমাকে নিয়ে হৈ চৈ অনেকটাই কমে এসেছে। সুইডেনে পুলিশ প্রহরা নেই আর। আমি এখন একা একাই বাসে ট্রেনে চড়ি, রাস্তায় হাঁটি। এক বছরে পুলিশ প্রহরায় যা জেনেছিলাম, একা সাতদিনে তার চেয়ে বেশি জেনেছি। এই জীবনটির স্বাদ অন্যরকম, নিজেকে চিড়িয়া জাতীয় কিছু মনে হয় না, মানুষ মনে হয়। আর মানুষের ভোগ দুর্ভোগ বইতে আনন্দও তো কম নয়। দুদিন পর ইতালি যাচ্ছি, গভরমেন্ট প্রচুর পুলিশ দেবে, আমি বলেছি ওসবের দরকার নেই। কে শোনে কার কথা! এরা হয় বোকা, নয় বেশি চালাক। জুনে আবার ব্রাসেলসে যেতে হবে। ওখানে ইওরোপিয়ান পার্লামেন্টে একটি

অনুষ্ঠান আছে। গতবার বেলজিয়ামে চার গাড়ি পুলিশ ছিল, সারা এয়ারপোর্টে বন্দুক তাক করে ইউনিফর্মড পুলিশেরা দাঁড়িয়ে ছিল, আমি যাবো বলে আবার এসবের ব্যবস্থা হবে- ভাবলেই অস্বস্তি হয়। জার্মানিকে বলেছি আমার কিন্তু পুলিশ লাগবে না। ওরা বলেছে, তোমার হয়তো পুলিশ দরকার নেই, কিন্তু তোমাকে পুলিশ দেওয়া জার্মান সরকারের দরকার। অনেক হল পুলিশের আলাপ। এখন এক লেসবিয়ানের গল্প বলি। এক র‍্যাডিক্যাল লেসবিয়ান ফেমিনিস্ট। কানাডার মেয়ে। ফ্রাংকোফোন। কিউবেকের। থাকে প্যারিসে। আমার যত পাবলিক মিটিং হয়েছিল প্যারিসে, ওকে দেখতাম প্রথম সারিতে বসে থাকতে, চমৎকার চমৎকার প্রশ্ন করতে। পুলিশের বাধা ডিঙিয়ে কারও সঙ্গেই আমার কথা বলবার জো ছিল না। তবু মেয়েটির সঙ্গে শেষ মিটিংএ কয়েক সেকেন্ড কথা বলি, সেই খুশিতে একদিন সে চলে আসে স্টকহোমে, সাতদিন আমার বাড়িতেই ছিল। এবার আবার এল, ছিল পনেরোদিন। চমৎকার মেয়ে। নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার ভাবনা যেমন, ওরও ঠিক তেমন, তবে ও আবার এক কাঠি এগিয়ে। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেসবিয়ানিজম ওর কাছে পলিটিক্যাল স্ট্রাগল। এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক হয়েছে। আমি যে ওর মতামত পুরো মেনেছি তা নয়। পশ্চিমে মিলিট্যান্ট ফেমিনিস্ট আন্দোলন মার খেয়েছে। লেসবিয়ানরাও বিপদে আছে। সেদিন কজন লেসবিয়ানকে চাকরিচ্যুত করা হল ব্রিটেনের নৌবাহিনী থেকে। পশ্চিমে এক্সট্রিম রাইট উইং ধীরে ধীরে পপুলার হচ্ছে, ফ্রান্সে লিপেন পনেরো পার্সেন্ট ভোট পেল, এ কিন্তু কম ভোট নয়। স্কিন হেড বাড়ছে, নিও নাৎসি বাড়ছে, এরা ইমিগ্রেন্ট, হোমোসেক্সুয়াল আর নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। পশ্চিমের ভালোটা দেখছি, মন্দটাও। প্রতিবাদ করছি। কেন নয় বলুন তো! মানুষের কোনও সীমানা থাকবে কেন! আমি এখন সীমানা এবং সীমা দুটোই ছাড়িয়ে যাচ্ছি। মা বলতেন, তুই কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। এখনও সাবধান হ। আমার জীবনে এ কাজটি কখনও করিনি, সাবধান হইনি। আসলে লেখালেখির চেয়ে জীবনের খুঁটিনাটি স্বাধীনতাতেই আমি মগ্ন থেকেছি বেশি। তা না হলে বলুন, বাংলাদেশের মতো দেশে কী করে বাড়িভাড়া নিয়ে একা থাকতে শুরু করেছি একটি মেয়ে! কারুকে তোয়াক্কা না করে এমন সব কাজ করেছি যা সমাজ একেবারে সয় না।

ইতালি থেকে ফিরে এসেছি। এখন ট্রেনে আমি বার্লিনের পথে। ট্রেনে যাওয়াই স্থির করেছি কারণ প্লেন আমার অসহ্য লাগে। প্লেনের টিকিট আছে। ও টিকিট থাকার পরও শখ করে ট্রেনের টিকিট নিয়েছি। এখানকার ট্রেনগুলো তো আর ভারত বাংলাদেশের ট্রেনের মতো নয়, যেন পাঁচতারা হোটেলে বসে আছি ট্রেনে তাই মনে হয়। আসল আনন্দ হচ্ছে জানালায় নিসর্গ দেখা। শুধু মেঘ দেখতে, শুধু শূন্যতা দেখতে আমার ভালো লাগে না। আমাকে দেওয়া হোক ফার্স্ট ক্লাস ফ্লাইট টিকিট, আর যেন তেন ট্রেন টিকিট। আমি ট্রেন টিকিট নেবো। মুশকিল হল, এই অপশানটা কেউ দেয় না আমাকে।

ইতালিতে যে এত কাণ্ড হবে ভাবিনি। পালেরমোতে ল্যান্ড করলাম ২৬ মে। সিসিলির সবচাইতে সুন্দর নগরী পালেরমো। সিসিলি কিন্তু আবার মাফিয়ার কেন্দ্র।

www.BDeBooks.Com

পাহাড় আর সমুদ্রের প্রায় মধ্যিখানে আমার থাকার ব্যবস্থা মনডেলায় না ট্যুর হোটেলে। চমৎকার, ব্যালকোনিতে দাঁড়ালে মন ভালো হয়ে যায়, সমুদ্র চিরকালই আমাকে মুগ্ধ করে, বিশেষ করে এর সীমাহীনতা। বিছানায় পাশ ফিরে শুলে সামনে সমুদ্র, সারাক্ষণই সমুদ্রের শব্দ, মন উতল জলে ভাসে। মনে পড়ে কক্সবাজারের সিবিচে কী ভীষণ হুল্লোড় করেছি উত্তরকৈশোরে। আমার কৈশোর যৌবন সব যেন খুব দূরের দূরের, এখন ব্যালকোনির ইজিচেয়ারে শুয়ে এককাপ চা হাতে নিয়ে উদাস হয়ে যেতে হয়, বিভিন্ন লোক আসে কখন কী লাগবে কোনও অসুবিধে হচ্ছে কী না জিজ্ঞেস করতে, খুব জটিল জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলতে- বুঝতে। আমি যেন আগের সেই আমি নেই, গোল্লাছুট খেলার আমি - নদী বা সমুদ্র দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আমি। বয়স বাড়ছে কী! আমি তো জানি আমার মনের বয়স মোটে বাড়ে না। ব্যালকোনির ঠিক নিচে পাথরের কিনার থেকে বেড়ে ওঠা একটি লাল জবা ফুলের গাছ দেখে হঠাৎ চমকে উঠি। জবা ফুলের সঙ্গে আসলে আমার কৈশোর যৌবন নয়, রীতিমত শৈশব জড়ানো। অ্যামনেস্টির মেয়েরা আসে। দুটো পোস্টার দেখায়। বেশ সুন্দর পোস্টার ছেপেছে ওরা কনফারেন্সের জন্য। তসলিমা নাসরিন ভাষণ দেবেন পালেরমো সিটি হলে। আহা কোথাকার কোন তসলিমা, মানুষের বাড়ি বাড়ি আশ্রয়ের জন্য ঘুরেছে এই সেদিন, ধর্মান্ধ পুরুষগুলোর খোলা তলোয়ার গলার পাশ দিয়ে পোচ মেরে গেছে, প্রায় মরতে মরতে একেবারে বুড়িগঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ছাড়িয়ে ম্যাডিটেরিনিয়ান সির ওপর।

এখন বার্লিনে। বেশ ভালো আছি। বেশ ভালো। একা থাকতে মন্দ লাগছে না। আগের মতো এখন আর ঘন ঘন ভাত খাই না, ঘন ঘন ডায়াল ঘোরাই না টেলিফোনের। অনেকটা সয়ে গেছে। বার্গার স্যানডুইচ বা পিৎজায় খুব একটা অসুবিধে হয় না। আজ পুলিশ সাইট সিয়িংএ নিল। জলঘড়ি, পুরোনো জার্মান পার্লামেন্ট, পাশের ফুটপাতে রাশান জিনিসপত্র বেচা যায় লেনিন পর্যন্ত, বার্লিন দেয়াল, যুদ্ধে ধ্বসা চার্চ, পূর্ব বার্লিনের মিউজিয়াম, সিটি হল, থিয়েটার, মনুমেন্ট ইত্যাদি দেখে ঘরে ফিরেছি। বার্লিন একটি সুন্দর সবুজ শহর। এর গল্প না হয় পরে হবে, আগে ইতালির গল্প বলি। সিকিউরিটি পুলিশগুলো খুব উদ্ধত, হাতে পিস্তল নিয়ে ঘোরে। রাস্তার ব্যাংক পাহারা দেয় ইউনিফর্মড পুলিশ। ট্রিগারে আঙুল রেখে পথচারীদের দিকে বন্দুক তাক করে। ভয়াবহ। সকালে আমার যাবার সময়। আমি যাই রোম হয়ে এনকোনার দিকে। এনকোনা এয়ারপোর্টে আমার রিসিভ করতে আসে অ্যামনেস্টির মেয়েরা। পুলিশ সহ ওরা গাড়ি করে নিয়ে যায় শহরের মাঝখানে গ্র্যান্ড হোটেলে। সামান্য বিশ্রাম নেবার পর প্রেসের লোকের সঙ্গে কথা বলতে নামতে হয় নিচে। আসলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা, এ আমার একেবারে পছন্দ নয়, রাজি হতে হয়েছে অ্যামনেস্টির কারণে। বেচারারা বড় নির্ভর প্রেসের ওপর। আমার কারণে ওদের যদি কিছু পাবলিসিটি হয়! ওদের আতিথেয়তায় ইতালি ঘুরছি, এটুকু ওদের জন্য করা সংগত বলেই করি। এরপর শহর ঘোরার পালা। সত্যি বলতে কী, এই আমার আসল কাজ। একটি পুরোনো বিশাল দেখতে সেইলিং বোট মানুষ ভিড় করে দেখছে। ভিড় সামলাতে পুলিশ নেমেছে পোর্টে।

চলে গেলাম পাহাড়ে। জাহাজের আকৃতির চার্চ। ধ্বংসাবশেষ রোমান থিয়েটারের। ওখানে দাঁড়ালে এখনও যেন ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে আসে। বিকেলে কনফারেন্স। সাহিত্য সংস্কৃতির বিল্ডিং। বেশ আধুনিক। বসলো আমার সঙ্গে গভরমেন্টের নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেত্রীরা। মূল বক্তা, মূল আকর্ষণ তসলিমা। অতএব তারা সামান্য সময় বলে ফ্লোর আমাকে দিয়ে দেয়। আমার বক্তব্যের পর আলোচনা শুরু হল। দর্শকরা মঞ্চে এসে প্রশ্ন করছে, তাদের মতামত জানাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ জমজমাট ছিল আলোচনা। ইন্টারেস্টিং বটে। ধর্ম সমাজ রাজনীতি নারী স্বাধীনতা নিয়ে খোলা মন্তব্য। দর্শকের মধ্যে এক ইতালিয়ান ছিলেন, বাংলাদেশে পনেরো বছর ছিলেন মিশনারিতে, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে প্রফেসারি করেছেন দীর্ঘদিন, অনর্গল বাংলা বলেন, আলাপ হল অনেকক্ষণ। অনুষ্ঠান শেষে মানুষের ভিড় অটোগ্রাফের জন্য, অনেকের হাতে আমার ইতালিয়ান লজ্জা। ওখান থেকে রাতের খাবারে যাওয়ার আগে আবার শহর দেখা। মেডিটেরিনিয়ান সি, টিপিক্যাল মেডিটেরিনিয়ান বুশ, হিলি এরিয়ায় গাড়িতে ঘোরা, ওপারে ফরমার যুগোশ্লাভিয়ায়, এনকোনার লোক ওদেশটি নিয়ে ভাবে, দুঃখ করে, ওরা তো জলজ প্রতিবেশি। এনকোনা শহরটি পালেরমোর মতো গরিব নয়। পোর্ট এরিয়া। এতেও পাহাড় ও সমুদ্রের মিশেল। তবে প্রাকৃতিক পালেরমো এনকোনার চেয়ে আকর্ষণীয় বেশি। সবচেয়ে নামকরা মাছের দোকানে এলাম। কতরকম মাছ যে খাওয়া হল তার হিসেব দিতে পারবো না। ২৫ জনের মতো অ্যামনেস্টির লোক আমার জন্য এই মাছ ভোজনের ব্যবস্থা করলো।

পরদিন রোম হয়ে ভেনিস উড়ে গেলাম। ভেনিস শহরে না গিয়ে আমাকে পাদোভার দিকে নিয়ে যাওয়া হল। লা রেসিডেন্ট বলে একটি হোটেল যেখানে আমাকে রাখা হল, সেটি চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। বিশাল অবস্থা। ছোটখাটো একটি অ্যাপার্টমেন্ট যেন আমার জন্য। অবাক হই অ্যামনেস্টি কী করে এত খরচ দিচ্ছে। ব্রিটিশ অ্যামনেস্টি তো আমার পেছনে এর একশ ভাগের এক ভাগও খরচা করতে পারেনি। যাই হোক, ক্রিস্টিনা আর রিকারডো আমাকে রাতে পাদোভায় নিল খেতে। অ্যামনেস্টির অনেকে অপেক্ষা করছিল। সকালে পাদোভার সিটি হলে প্রেস কনফারেন্স। টিভি রেডিও পত্রিকার প্রচুর সাংবাদিক। আমার বড় ক্লান্ত লাগছিল। পা ফুলে গেছে হাঁটতে অসুবিধে হয়। সকালে পাদোভার সিটি হলে প্রেস কনফারেন্স। এক নারীবাদী সাংবাদিক তার পত্রিকা নিয়ে এলেন, দেখি প্রচ্ছদে আমার ছবি, পাদোভা ইউনিভার্সিটির এক মেয়ে আমার ওপর থিসিস লিখছে জানিয়েছিল, একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে হাতে একতোড়া ফুল দিয়ে বললো আমি সেই মেয়ে যে তোমাকে ডিসটার্ব করেছি স্টকহোমে, মেয়েটি লিখছে থিসিস, এ বুঝি আমাকে ডিসটার্ব করা হল! আমি ওর চিঠির উত্তরই দিইনি, বোধহয় তাই ভেবেছে ডিসটার্ব। মেয়র এলেন, কিছু বই উপহার দিলেন পাদোভার ওপর, একবার অফিসে যেতে বললেন যাবার আগে। দুটো টিভি সেদিন ন্যাশনাল নিউজের জন্য ইন্টারভিউ নিল। মেয়রের রুমে গিয়ে দেখি মিটিং হচ্ছে। কালো কালো মানুষ। মেয়র পরিচয় করিয়ে দিলেন মোজাম্বিকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। বেরিয়ে এসে এক তেহরাসে। রেস্তোরাঁ বা ক্যাফের বাইরে চেয়ার পাতা জায়গা

www.BDeBooks.Com

বসে খেলাম। জুতো কিনলাম আশি হাজার লিরা দিয়ে। কী জুতো? সাদা কাপড়ের জুতো, ইতালির ইয়ং মেয়েদের মধ্যে এই ফ্যাশন খুব চলছে মোজা ছাড়া কাপড়ের জুতো পরা, আমাদের দেশে ভিখিরিরা যেমন পরে। আমার পঞ্চাশ হাজার লিরার নোটটি কোথায় হারিয়ে গেছে, অ্যামনেস্টির এক ছেলে পঞ্চাশ হাজার লিরা ধার দিল। ওখান থেকে পাদোভার সবচেয়ে পুরোনো চার্চ, বিভিন্ন স্কোয়ার, মূর্তি মনুমেন্ট দেখে হোটেলে ফিরলাম। সুন্দর স্নিগ্ধ শহরটিকে আমার ভালো লেগেছে বেশ। রাতে নানারকম পিৎজা খাবার আয়োজন। প্রতিবার অ্যামনেস্টির দশ বারোজন থাকছেই। তারপর বড় এক কালাচারাল সেন্টারে কনফারেন্স। দর্শক শ্রোতা ছিল পাঁচশর ওপর। জমেছিল অনুষ্ঠানটি। শেষে রাত দেড়টা অব্দি আড্ডা চলনো এক রেস্তোরাঁর বিশাল তেহ্‌রাসে। মধ্যবয়স্ক এক ইতালিয়ান মহিলা, বেশ আমুদে, এক বাঙালি সিভিল সার্ভেন্টের সঙ্গে তিন বছর ৬৭/৬৮ সালে প্রেম করেছিলেন জেনেভায়, তার স্মৃতি চারণ করলেন। উপভোগ করার মতো, কিছু বাংলা গান কিছু কথা ভুল উচ্চারণে বলে গেলেন। সোমালিয়ার এক মেয়ে, পঁচিশ বছর ইতালিতে থাকে, শিক্ষিত, সে আমার পিছু ছাড়লো না। কত কত মানুষ যে এসে বইয়ে সই নিল, দেখে অবাক হলাম। পরদিন সকালে সাবেনা নামের সুন্দরী মেয়েটি এল, থিসিসের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারি কি না। আমি যেরকম আলসে উদাসিন, আমি যে কিছুই আসলে করবো না সে আমি জানি, কিছু লোকের নাম দিয়ে দিলাম ওদের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য। এরপর আমরা গাড়ি করে ভেনিস। সাবেনাও গাড়ি করে এল, পথে যদি কিছু কথা বলা যায় আমার সঙ্গে। ভেনিসে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ এবং অ্যামনেস্টির লোকেরা। আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল ভেনিস পৌঁছে, কত শুনেছি ভেনিস শহরের কথা। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম জল-ট্যাক্সি করে, প্রথমেই সিটি হল, আমাকে সম্বর্ধনা দিল লোকাল পার্লামেন্ট, ভেনিস শহরের পেইন্টিং দিল উপহার, পুলিশগুলো এমন সিরিয়াস যে আমি হাঁটতে গেলে মানুষকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে। সবাই খুব অবাক চোখে তাকায়। আমার এত লজ্জা হয় যে অ্যামনেস্টির ছেলে সিমোনকে বলি পুলিশকে বলতে পথচারি পর্যটকদের যেন ধাককা দিয়ে না সরায়। এখানে কেউ আমাকে খুন করবে না। এরপর জল-ট্যাক্সি করে ভেনিসের সৌন্দর্য দেখা, বাড়িঘরে প্রচুর দৈন্য, রেস্তোরেশন হচ্ছে না, ভেনিসকে আরও নিখুত আশা করেছিলাম বোধহয়.. কিন্তু সবকিছুর পরও এটি যে একটি ইউনিক শহর, জলের ওপর ভেসে ওঠা বাড়িঘর, দেখে যা কিছুই বলি না কেন মুগ্ধ হতেই হয়। ছোট ছোট ক্যানেলগুলোর জল নোংরা, কখনও কখনও পচা জলের গন্ধও বেরোয়। বিশেষ করে সামারে। ওইসব ক্যানেলে জল থাকে স্থির, হবে না কেন! প্যালেস আর প্রিজন পাশাপাশি। প্যালেস থেকে বিচার শেষে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হত প্রিজনে, কেবল একটি ব্রিজ পার হতে হত তাদের, ব্রিজটির নাম ব্রিজ অব সাই-দীর্ঘশ্বাসের সাঁকো। বন্দিরা প্রিজনে যাবার আগে শেষবার দেখে নিত লেগুন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলত। মনে আছে বায়রনের কবিতা, আই স্টুড ইন ভেনিস, অন দ্য ব্রিজ অব সাইস, এ প্যালেস এণ্ড এ প্রিজন অন ইচ হ্যান্ড: আই স ফ্রম আউট দ্য ওয়েভ হার স্ট্রাকচারস রাইজ.. ।

গেলাম দুপুরে বিখ্যাত মাছের রেস্তোরাঁয়। কত রকম মাছ যে খাওয়া হল। সিমোন (সিমোন ভেনিস অ্যামনেস্টির প্রেসিডেন্ট)সিফিস খেল না। খেল না কারণ সে ইহুদি। অবাক হলাম, সমুদ্রের ওপর যার জন্ম সে কী করে সমুদ্রের মাছ না খেয়ে জীবন কাটাতে পারে! আর আমি, মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে শুয়োরের মাংস তো খাচ্ছিই, ভেনিসে বসে নানারকম শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাসও বাদ দিচ্ছি না কিছু। সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার, ভেনিসে পৌঁছার পর থেকে পাঁচজন ক্যামেরাম্যান সারাদিন ফলো করছে আমাকে, পাগলের মতো হাজার হাজার ছবি তুলে যাচ্ছি, এত ছবি দিয়ে কী করবে ওদের পত্রিকা আমি জানি না। ওদের এত যে থামতে বলেছি, মোটেও থামার কোনও লক্ষণ নেই। চিবুচ্ছি, গিলছি তারও ছবি তোলা চাই। খেয়ে দেয়ে জল-ট্যাক্সি করে আর হেঁটে শহর দেখা এবং স্কোয়ারে, থিয়েটারে হাঁটাহাঁটি আর ঘেটোর গল্প শোনা। ঘেটো শব্দটি কোত্থেকে এসেছে জানো তো! ভেনিসের এই এরিয়ার নাম ঘেটো। এখানে ইহুদিরা থাকতো। নেপোলিয়ন ভেনিসে আসার আগে ইহুদিদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতো ভেনিসের রাজা। ওদের প্রায় বন্দি করে রাখা হত ঘেটো এরিয়ায়, বাইরে বেরোতে দেওয়া হত না। রাতে এরিয়ার গেট বন্ধ করে দিয়ে জল-পুলিশ থাকতো পাহারায়, কোনও ইহুদি বেরোলে তাকে মেরে ফেলা হত। গাদাগাদি করে ইহুদিরা ওখানে থাকতো বলে আজ যে কোন বস্তিরই আরেক নাম ঘেটো। নেপোলিয়ান এসে ইহুদিদের মুক্ত করে। টেলিভিশন ক্যামেরা দাঁড়িয়েছিল, আমার সাক্ষাৎকার নেবেই নেবে। ভেনিসের টেলিভিশন নিউজে তা দেওয়া হবে। ভেনিস শহরটি একশটি দ্বীপ নিয়ে গড়া। আরমেনিয়ানরা পুরো একটি দ্বীপের মালিক। ওদের কনভেন্ট, চার্চ সেই দ্বীপে, আরমেনিয়া থেকে প্রচুর লোক আসে এখানে পড়তে, সেই আরমেনিয়ানদের কালচারাল সেন্টারে আমার কনফারেন্সের আয়োজন। প্রচুর দর্শক শ্রোতা। আমার ওপর বললো এক নারীবাদী, আরেকজন ফিলোসফির প্রফেসর, তিনিও লেখক, তিনি লজ্জা সম্পর্কে বললেন, ট্রান্সলেশন করছিল একজন- শুনে অবাক হই এই ভেনিস শহরে বসে, এই দূর দূরান্ত লেগুনে লজ্জা বইটির সিরিয়াস আলোচনা। অতপর আমার বক্তব্য। প্রশ্নোত্তর পর্বও বেশ জমল। সিরিয়াস সব শ্রোতা। বিশ্বে নাম হয়েছে বলে চেহারা দেখতে আসা নয়। বামপন্থী কিছু ছেলে ছিল, ওদের প্রশ্ন শুনে বেশ ভালো লাগলো। অনুষ্ঠান শেষে যখন অটোগ্রাফ আর বই সই করবার পালা, মধ্যবয়স্ক এবং বেশ কিছু যুবক বললো তারা ভেনিস শহরের নয়, আমার অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে সেন্ট্রাল ইতালি থেকে এসেছে প্লেনে। এক যুবক বললো, বইএ যেন তার নাম আর তার লাভারের নাম লিখে দিই, নিজেই বললো, আমার লাভার আসতে পারেনি এখানে, তুমি ওর নাম লিখলে ও খুশি হবে। তারপর যে নাম বললো তা একটি ছেলের নাম, নিজেই আবার বললো আমি হোমোসেক্সুয়াল। কী সহজ স্বীকারোক্তি, শুনে মুগ্ধ হলাম। অনুষ্ঠানের পর খানিকটা বিশ্রাম হোটেলে। এরপর রাতের খাওয়া অ্যামনেস্টির বেশ কজন মেম্বারের আমন্ত্রণে, এরপর আবার রাতের ভেনিস দেখা। রাস্তায় কিছু লোক মরক্কোর জিনিসপত্র বিক্রি করে, পুলিশ এত সিরিয়াস যে এক মরক্কান আমার দিকে তাকিয়েছিল বলে ধমক

www.BDeBooks.Com

দেয়, এরপর সে লোক আসে পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে। সাদা পোশাকের পুলিশ, বোঝা তো যায় না বাইরে থেকে যে পুলিশ। একদফা মারামারি হয়ে যায় ওদের মধ্যে। রীতিমত নাক ভাঙা চোয়াল ফাটা মারামারি। আর মেয়ে-পুলিশ যেটি ছিল সে আমাকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে আসে। চার্চ আর প্রাসাদের সামনে চারকোনা বিল্ডিং করে যে বিশাল স্কোয়ারটি তৈরি করা হয়েছে, তা দেখে নেপোলিয়ান বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ড্রইংরুম এটি। এভাবে এক্সপ্লোর, এক্সপ্লোর। ডুবে যাই স্মৃতিতে, নিমগ্ন হই ইতহাসে, ঘ্রাণ নিই ১৫/১৬ শতাব্দির। লিখি-

জলে ভাসা পদ্ম আমার, ভালো আছিস
ভেনিস?
লোকে তোর রূপ দেখে আর আমি দেখি দীর্ঘশ্বাস।
ঘোলা জলে সাঁতার কাটিস
পালক-খসা বুড়ি হাঁস।

মাঝ রাতে কার কান্না শুনে জেগে, দেখি তুই,
জলের খাঁচায় আটকে পড়া রুপোলি মাছ!
কেউ বোঝে কি? কেউ করে না আঁচ।

যুবতীদের স্তন দেখতে সকলেরই আনন্দ হয়
কজন জানে তার তলে কী ক্ষয়!
তোর শরীরে ভাসবে সবার গ্রীষ্মসুখের ভেলা-
ওসব ভেবে কী হবে আর, ভালো থাকিস
ভেনিস।
ইচ্ছে হলে খেলিস
আমার সঙ্গে বাকি জীবন কষ্ট-মোচন খেলা।

পরদিন ভোরবেলা প্লেন, রোম হয়ে টুরিন। রোম পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমার নির্ধারিত প্লেন আমার জন্য অপেক্ষা না করে ছেড়ে চলে যায়। বসে থাকতে হয় এয়ারপোর্টে দীর্ঘ চার ঘন্টা। অবশেষে টুরিন পৌঁছি। টুরিনে অপেক্ষা করছিল অ্যামনেস্টির লোক, পুলিশ। সবসময় আমি যেখানেই যাই সূর্যালোক নিয়ে যাই, টুরিনে বৃষ্টি নিয়ে এলাম। এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেলাম, পুলিশ বিল দিল, পুলিশকে এত মানবিক হতে খুব কম দেখা যায়। ওখান থেকে রিকার্ডো, আলেজান্দ্রা আমাকে নিয়ে গেল টুরিন দেখাতে দেখাতে হোটেলে। বিশাল হোটেল, চমৎকার রুম। ওরা বললো সাংবাদিকরা কথা বলতে চায় অনুষ্ঠানের আগে। আমি বললাম আমি বিশ্রাম নিতে চাই, টায়ার্ড। অ্যামনেস্টির প্রেস অফিসার ছিল হোটেলে, সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছিল। আলেজান্দ্রা বলে দিল ইন্টারভিউ সম্ভব নয়, তসলিমা টায়ার্ড। শেষ পর্যন্ত ইতালির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পত্রিকার একজন সাংবাদিককে ওরা কথা বলার জন্য পাঠালো।

আমার আধঘন্টা বিশ্রামের পর পাঁচ মিনিটের জন্য। সামনে পেছনে দুগাড়ি পুলিশ আর মাঝখানে আমাদের গাড়ি। পৌঁছলাম কনফারেন্স হলে। বিশাল হল। লোক বসা। গভরমেন্টের মহিলারা স্টেজে। আমি স্টেজে ঢুকলেই হাততালি শুরু হয়। অতপর আলোচনা, সকলে আমাকে নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর বেইজিংএর জাতিসংঘ মিটিং নিয়ে দু কথা। নারীবাদী এক মহিলা তো কাঁদলেনই শেষে আমার হাত চেপে ধরে। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকরা ছোট ছোট ইন্টারভিউএর জন্য ভিড় করলো। দিয়ে, সকলে দাঁড়িয়েছিল রাতের খাবারের জন্য বুক করা রেস্টুরেন্টে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য, এদিকে আলেজান্দ্রা মন খারাপ করে আছে ওদের ব্যাবহারে, কারণ ওরা আমার বিশ্রামের দিকে খুব একটা নজর দেয়নি. তাই ও চাইছিল দলের আমন্ত্রণে না গিয়ে দুতিনজন মিলে কোনও রেস্টুরেন্টে খেতে। ওর কথায় রাজি হলাম। অতপর গাড়িতে ঘুরে টুরিন দেখা। বিভিন্ন স্কোয়ার, একটি সেনেগগ, যেটি সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার টুরিনে, জুইসরা খরচ পোষাতে না পেরে সরকারকে দিয়ে দিয়েছিল। টুরিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি, বেশ পরিচ্ছন্ন। একসময় এ শহরটি ইতালির রাজধানী ছিল। রোমান কিছু স্মৃতি এখনও আছে। আছে চমৎকার প্যালেস, যা ফরাসিরা দখল করেছিল। অনেক রাত অব্দি শহর দেখে ফিরে আসি হোটেলে। পরদিন ভোরে টেজন। ট্রেন জার্নি আমি পছন্দ করি। আকাশ-পথ আমার একদমই ভালো লাগে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, ট্রেনে চলার সুযোগ আমার নেই বললেই চলে। ইতালিতেই প্রথম সম্ভব করেছি আকাশ থেকে মাটিতে নামতে। ট্রেনে গেলাম ফ্লোরেন্স। এলিজাবেথা দাঁড়িয়েছিল, সঙ্গে আমেরিকান ট্রান্সলেটর নিয়ে। হ্যাঁ শুরু হল ফ্লোরেন্স দেখার পালা। এলিজাবেথা এত চমৎকার মেয়ে, সারাক্ষণই আমাকে ইতিহাসের গভীরে নিয়ে যাচ্ছে, সারাক্ষণই বিশাল বিশাল কিছুর সামনে দাঁড় করাচ্ছে। মেয়েটি পাগলের মতো আমাকে নিয়ে মেতে রইল। হোটেলে পৌঁছে জিনিসপত্র রেখে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম প্রথমেই প্যালেস, যেটি এখন মেয়রের অফিস। প্রচুর সাংবাদিক সেখানে ভিড় করেছে। মেয়র আমার জন্য অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দিলেন, প্রেসিডেন্ট অব ফ্লোরেন্স পার্লামেন্ট, নাম দানিয়েলা, ইতালিয় ভাষায় একটি স্টেটমেন্ট তিনিও দিলেন, ইংরেজেতে তার তর্জমা হল, ফ্লোরেন্স সিটি তসলিমাকে পেয়ে গর্বিত, আনন্দিত। ফ্লোরেন্স সিটি তাকে যে কোনও রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। ফ্লোরেন্সের দরজা তসলিমার জন্য সবসময় খোলা। তসলিমাকে সম্মান জানিয়ে এই আর্ট কালচারের শহর ফ্লোরেন্স নিজেকেই সম্মানিত করলো। মেয়র আমাকে দিলেন একটি মেডেল। এরপর প্যালেসটি দেখানোর ব্যবস্থা। খুলে দেওয়া হল একটির পর একটি ঘর, যেখানে রাজ-আকিঁয়েরা ছবি আঁকত, ফ্রান্সিস ওদের একজন, সেই ছবি আঁকার ঘর থেকে কোনও দুর্যোগ এলে চোরা পথে কী করে পালাতে হবে তারও সিঁড়ি ফিড়ি আছে, গোপন কুঠুরি, খুলে দেওয়া হল মধ্যযুগের সেই পৃথিবীর মানচিত্র আঁকার ঘর। বিচিত্র সব মানচিত্র দেখে আপনাকে বড় মনে পড়ছিল। আপনার নিশ্চয় খুব ভালো লাগতো দেখে পৃথিবীর জিওগ্রাফি-অনুমান আগে কেমন ছিল, আপনি তো লিখেছেন কেবল ভারতের অনুমান নিয়ে। আপনাকে পাঠাবার জন্য মানচিত্র বিষয়ে কোনও বই আছে কি না জিজ্ঞেস করলাম।বলল একটি

www.BDeBooks.Com

বই শিগগির বেরোবে। অজস্র ভাস্কর্য, বিশাল হলঘর যেখানে আগে রাজাদের বৈঠক হত, কী ভীষণরকম উজ্জ্বল। সবচেয়ে মজার হল, সেই পেলেৎজা ভৎসা থেকে গোপন পথে শহরের এক কোনা থেকে আরেক কোনার দুর্গে পৌঁছে যাওয়া যায়। শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওরা সবাই প্রস্তুত থাকতো।

ডেভিডের একটি কপি রাখা প্যালেসের দরজায়। ডেভিড, আমার প্রিয় ভাস্কর্য। ওর হাত ও মাথা যদিও প্রোপরশন মানেনি, ওর নিস্পাপ মুখ আর ঘৃণা ছুঁড়ে দেওয়া শত্রুর দিকে- সে অপূর্ব। পরে অবশ্য অরিজিনাল ডেভিড দেখেছি মিকেলেঞ্জেলোর মিউজিয়ামে, মিউজি উফিজির একটি অংশে। মিকেলেঞ্জেলোর অন্য কাজগুলো -বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রাম বেশ ভালো লেগেছে। ভিঞ্চির ছবি দেখলে বোঝা যায় তিনি কী করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন গোতো, ফিলিপিনো লিপি, ফ্রান্সেসকো, বটিচেলির আবহাওয়া থেকে। ভিঞ্চির রিলিজিয়াস ছবিগুলোয় এঞ্জেলদের ডানা পাখির ডানার মতো হত, সোনালি স্বর্গীয় নয়, মেরিকে আঁকলে পায়ের নিচের ঘাসগুলোই জীবন্ত হত বেশি মেরির চেয়ে। ফ্লোরেন্সের আর্ট এক্সপার্ট মিউজিয়ামগুলোয় আমার সঙ্গে ঘুরেছেন। তিনশ ট্যুরিস্টের লম্বা লাইন তোয়াককা না করে আমাকে সোজা ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং নিয়ম ভেঙে মেডেসির ১৬ শতাব্দির বাগানে ঢোকা। অপূর্ব।

হাঁটলাম ৮০০ সালের সেই বিখ্যাত ব্রিজে, যেখানের দোকানগুলো এখনও আগের মতো, যেন কাঠের বাক্স। না নিখিলদা, ফ্লোরেন্স আমার বলে বোঝাবার উপায় নেই। যদি কখনও সম্ভব হয়, ফ্লোরেন্স দেখতে যাবেন। এ না দেখলে জীবন পূর্ণ হয় না। ফ্লোরেন্সের মানুষগুলোও অসাধারণ। প্রতিদিন যাদের সঙ্গে আমার লাঞ্চে ডিনারে কথা হয়েছে, এরা পারলে জীবন দিয়ে দেয়। এলিজাবেথা তো একাই আমার টেলিফোন বিল দুলক্ষ লিরা, যা যা কিনতে ইচ্ছে করে আমার, সবই দুহাত ভরে দিল, আমাকে এক পয়সা খরচা করতে দিল না। আবার কবে ফ্লোরেন্স আসবো, তাই নিয়ে পীড়াপীড়ি। ফ্লোরেন্সে কনফারেন্স হল সিটি হলে। দুদিন ছিলাম। শেষ দিন আড়াইশ ইতালিয়ান কেবল অ্যামনেস্টি ফ্লোরেন্সের নয়, ফ্লোরেন্সের পাশের এক সিটির মেয়র, এবং ফ্লোরেন্স মেয়র, পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট আমাকে রিসিপশন দিল যৌথভাবে। দিল মেডেল, গিফট। তাসকুনিয়া-অনেকগুলো সিটি নিয়ে বড় একটি রিজন, ফ্লোরেন্স যার একটি সিটি, সেই প্রেসিডেন্ট আমাকে সম্বর্ধনা জানালো, দিল মেডেল, নাৎসি বিরোধী এক মেডেল। পরদিন ট্রেনে গেলাম রোম। স্টেশনে সবাই এসেছিল। ওরা প্রায় কাঁদো কাঁদো আমাকে ছেড়ে। রোমে অন্য অবস্থা। অযথা পুলিশের বাড়াবাড়ি। অ্যামনেস্টির সব প্রোগ্রাম চেঞ্জ করা হল। হোটেল, কনসার্ট, এয়ারলাইন, সময়। পুলিশগুলো সারাক্ষণই পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল রেখে আমার সঙ্গে চলেছে। ঘটনা হল, বাংলাদেশ অ্যামবেসি থেকে ফোন পেয়েছে অ্যামনেস্টি, ইতালিতে বাস করা কিছু বাংলাদেশি নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। অ্যামনেস্টি সরকারকে জানিয়েছে এসব খবর। এখন মিনিস্ট্রি থেকে কড়া পাহারা দেবার হুকুম এসেছে। যাই হোক, ভ্যাটিকান থেকে শুরু করে রোমের ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো দেখা হয়েছে। মিউজিয়াম দেখার সুযোগ ছিল না। ফ্রান্সেসকা চমৎকার মহিলা, প্রেসিডেন্ট অব ইটালিয়ান অ্যামনেস্টি,

যথেষ্টই যত্ন আত্তি করলেন। জানালেন মেয়র শিগগির ডিক্লেয়ার করছেন আমাকে সিটিজেন অব রোম, অফিশিয়াল ডিশিসান হয়ে গেছে। পরদিন সকালে রোমের ন্যাশনাল টিভির লাইভ অনুষ্ঠানে আমার ইন্টারভিউ। তা শেষ করে ঘুরে বেড়ানো, পথে দেখলাম বাংলাদেশিরা চশমা মালা ইত্যাদি বিক্রি করছে, এক বাঙালি অটোগ্রাফ নিতে আমার কাছে আসতে চাইলে পুলিশ ধাককা দিয়ে ফেলে দেয় তাকে। মায়াই হয় খানিকটা।

www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com